দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা ।। ১৯ মে - ২০১৪ ।।
৪ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২১ ।। website : www.eswastika.com

নরেন্দ্র মোদীর ভারত-ভাবনা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

পশ্চিমবঙ্গ এখন উলঙ্গ রাজার দেশ

প্রতিবাদ করলে জুটবে মাওবাদী তকমা □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : এই ভোটের বড় উপহার

রাহুল গান্ধী □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

মোদী আতঙ্ক কেন এবং কাদের ? □ দেবীপ্রসাদ রায় □ ১২

মোদীর ভারত-ভাবনা □ তারক সাহা □ ১৪

বিশ্বশান্তির জন্য প্রয়োজন হিন্দুত্ব □ সমীর কুমার দাস □ ২০

কৌলাচার □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১

গড়বেতা □ ড: প্রণব রায় □ ২৩

নরেন্দ্র মোদী-ই এবারের ভারত কাণ্ডারি □ কাঞ্চন গুপ্ত □ ২৭

কংগ্রেসের ভোট রাজনীতির জন্যই অসমে বোড়ো এলাকায় দাঙ্গা □ ২৯

পাঞ্জাবের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল ১৮৫৭-র মহাসংগ্রাম দমনের
আরও কিছু ভয়ঙ্কর তথ্য □ ৩১

অ্যায়সা মার মারত কি অভিতক রওয়ত □ অমলেশ মিশ্র □ ৩৩

নারীর অধিকার — মানুষের সমাজ : একটি আলোচনা □ সলিল বেজ □ ৩৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

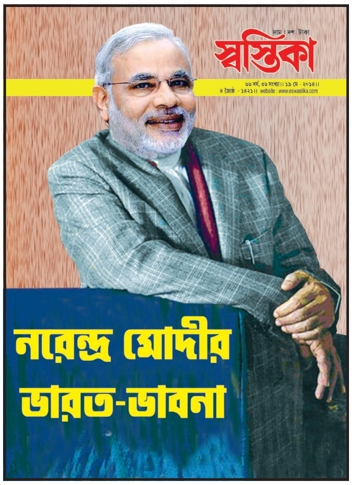

পৃঃ ১৪ - ১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □

অন্যরকম : ৩৪ □ □ সুস্বাস্থ: ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ □

□ □ খেলা : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ১৯ মে - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে
২৬শে মে
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৬শে মে
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কেন্দ্রে মোদী সরকার

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ। ফলাফলও প্রকাশিত। কেন্দ্রে সরকার গড়ছেন বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে অনেক নতুন তথ্য। সৃষ্টি হয়েছে নানা নজির— ভারতীয় রাজনীতির এক নতুন দলিল। নানা তথ্য ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এবারের বিষয়— ‘কেন্দ্রে মোদী সরকার’।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

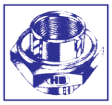

HB ®
AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদী

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তামাম বুথ-ফেরত সমীক্ষায় যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের আগামী প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীর আসীন হওয়ার সম্ভাবনাই উজ্জ্বল। বুথ-ফেরত সমীক্ষার ফল যে অতীতে সব সময় মিলিয়া গিয়াছে— যেমন, ২০০৪-এ, এমন নয়। তবুও এই ধরনের সমীক্ষা হইতে নির্বাচনী চালচিত্রের একটা আভাস পাওয়া যায়। সম্প্রতি চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটে যে পেশাদার সংস্থা প্রকৃত ফলাফলের সঙ্গে তাহাদের সমীক্ষা প্রায় হুবহু মিলাইয়া দিতে পারিয়াছিল, সেই 'চাণক্য' দাবি করিয়াছে, এনডিএ তো বটেই, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে চলিয়াছে বিজেপি-ও। বিজেপি-ই পাইতে পারে ২৯১টি আসন। এনডিএ পৌঁছাইতে পারে ৩৪০-এ। ঠিক এইভাবেই ১৫ বছর আগে ১৯৯৯-তে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়াছিল এনডিএ। সেই সময় এনডিএ পাইয়াছিল ২৯৮টি আসন। এইবার এই প্রথম ২০০ আসনের গণ্ডি পার করিতে পারে বিজেপি।

এই ফলাফল (সম্ভাব্য) বিজেপি-র সাংগঠনিক দক্ষতা, নিখুঁত পরিকল্পনা ও তাহার সুষ্ঠু রূপায়ণ, কার্যকর্তাদের অদম্য উৎসাহ, সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদীর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও 'গুজরাট মডেল' তুলিয়া ধরিয়া সুশাসনের— 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্ননেন্স' এবং ভারতীয় মেধার সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির মেলবন্ধনের আশ্বাস যাহা নবীন প্রজন্মকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহার ফসল। নির্বাচনী প্রচারে শ্রীমোদী স্বয়ং যেভাবে সারা দেশ জুড়িয়া ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করিয়াছেন, ৪৭৭টি জনসমাবেশে ভাষণ দিয়াছেন এবং ৫০০০-এরও বেশি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ৮১.৪০ কোটি ভোটারকে আপন বাচনভঙ্গি ও সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের অভিমুখে ঘুরাইবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাও উপেক্ষণীয় নয়। দেশের আম-জনতার বাঁচিয়া থাকিবার লড়াইটা যে কত কঠিন, তাহা তিনি বোঝেন। কেননা তিনি নিজেই জানাইয়াছেন— তিনি ট্রেনে চা বিক্রয় করিতেন। গত বারো বছর ধরিয়া তাঁহাকে নিত্য-নূতন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু শীর্ষ আদালতের রায়ে তিনি নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। এই অপ্রতিরোধ্য দৃঢ়তাই তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হইতে অনেকটা আগাইয়া দিয়াছে।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার একটি স্থায়ী ও মজবুত সরকার উপহার দিতে পারিবে। ইউপিএ-র দ্বিতীয় আমলে যে নীতি-পঙ্গুত্ব দেখা দিয়াছিল, এখন সেই বাধা আর না থাকিতে পারে। সেই সূত্রে নীতিপঙ্গুত্ব কাটাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে দেশের অর্থনীতিও। লোকপাল, নির্বাচনী সংস্কার, বিচারপতি নিয়োগ প্রভৃতি সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠান নীতিপঙ্গুত্ব হীনতার কারণে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করিতে পারিতেছে না, এইবার সঠিক দিশায় কাজ করিতে সক্ষম হইবে। বস্তুত স্থায়িত্ব ও মজবুত নেতৃত্বের সরকারের আশায় দেশের মানুষ দুই হাত তুলিয়া বিজেপি-কে সমর্থন জানাইয়াছে।

সরকার চালানো ও দেশ-পরিচালনার মধ্যে যে ফারাক রহিয়াছে শ্রীমোদী তাহা জানেন। বিধানসভায় যে-কোনো ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে পারিলেই সরকার চালাইবার সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, কিন্তু দেশ পরিচালনার জন্য সকলের, এমনকী বিরোধীদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। সেইজন্য এনডিএ প্রথম হইতেই সকলের জন্য দরজা খুলিয়া রাখিয়াছে। ইন্ডিয়া ফার্স্ট—ভারতই প্রথম— এই ভাবনায় উদ্দীপিত সকলেরই এই সরকারে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ রহিয়াছে।

এই ফলাফল প্রকৃত অর্থে সিদ্ধান্তমূলক নেতৃত্বের বিষয়টি সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে বলিয়াই এনডিএ সুবিধাজনক অবস্থানে রহিয়াছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত ফেডারেল ফ্রন্ট-এর অবস্থাও তথৈবচ। বামশক্তির ফলাফলও সীমায়িত। তাই প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন দিল্লীর ৭নং রেসকোর্স রোডে শ্রীমোদীর পৌঁছানো সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

সুভাষিত

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবং হি দৈবমিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।। (পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদঃ)

প্রযত্নশীল পুরুষসিংহকেই ঐশ্বর্যলক্ষ্মী বরণ করে থাকে। যা কপালে আছে তাই হবে এরকম কথা কাপুরুষেরাই বলে থাকে। ভাগ্যের উপর ভরসা না করে মানুষের নিজ শক্তি অনুসারে কাজ করা উচিত। চেষ্টা করার পরেও যদি সফলতা না আসে তা হলে তাতে কি দোষ?

সংবাদ প্রতিবেদন

আওয়ামি লিগের সঙ্গে হেফাজতের সমঝোতায় বাংলাদেশে হিন্দুরা আতঙ্কিত

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। হেফাজত-জামায়াত-বিএনপি-র সমঝোতায় চিড় ধরেছে? পাকাপোক্ত ক্ষমতার স্বপ্নে কি হেফাজত- জামায়াত-আওয়ামি লিগ নতুন ধারা তৈরি করছে? এ কারণেই কি জামায়াত-হেফাজতের মন পেতে গণজাগরণ মঞ্চকে বিভক্ত করে এবং নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে তাদের দুর্বল করে ফেলা হয়েছে, যাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে তরুণ প্রজন্ম মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে? সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই তিনটি প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগের নেতৃবৃন্দ ও তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধর্মান্ধ হেফাজতকে নির্মূল করার জন্যে সবসময়ই জান-কোরবান। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দলে দলে জামায়াতিদের আওয়ামি লিগে যোগদান, ফুল দিয়ে বরণ এবং আওয়ামি লিগের প্রতি হেফাজত আমির শাহ আহমেদ শফির একেবারে খাদে নামিয়ে আনা নরম সুর সেই অবস্থানের সঙ্গে মিলছে না। একটা বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। গত কয়েকমাসে দেশের কয়েকটি জেলায় জামায়াতের নেতা-কর্মীরা আওয়ামি লিগে যোগদান করেছেন। সর্বশেষ যোগদানের ঘটনাটি ঘটেছে পাবনা জেলার আতাইকুলা ইউনিয়নে। জামায়াতের ইউনিয়ন আমির রাজ্জাক হোসেন রাজা ২০০ নেতা-কর্মী নিয়ে আওয়ামি লিগে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের আন্তরিক আবেগে বরণ করে নিয়েছেন আওয়ামি লিগ নেতারা। গত ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামি লিগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ কুষ্টিয়ায় কুখ্যাত জামায়াত নেতাকে ফুল দিয়ে দলে বরণ করে এই নতুন ধারার সূচনা করেন। হানিফ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারি ছিলেন মন্ত্রী মর্যাদার। আওয়ামি লিগের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গেছে, এই ধরনের যোগদানের ঘটনা শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশেই হচ্ছে এবং তা অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে।

হেফাজত গত বছরের ৫ মে ঢাকায় মতিঝিলে সমাবেশ করে সরকার পতনের আন্দোলনে নেমেছিল। তাদের মাথায় ছাতা ধরেছিল জামায়াত ও বিএনপি। রীতিমতো গুলি ছুঁড়ে সমাবেশ পণ্ড করতে হয়েছিল। তার আগে মতিঝিল ও আশেপাশের এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে হেফাজতিরা। সেই হেফাজত প্রধান আহমেদ শফি গত ১১ এপ্রিল চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানে সমাবেশ করে বলেছেন, ‘সরকার, আওয়ামি লিগ, ছাত্রলিগ সবাই আমাদের বন্ধু। এদের সঙ্গে আমাদের কোনো আদাওয়াত (শত্রুতা) নেই। কেউ যদি বলে, হাসিনা সরকার আমাদের দুশমন, এটা হচ্ছে আপনাদের বোঝার ভুল। এদের কাউকে আমি কোনোদিন গাল দিইনি।’ একেবারে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গেছেন শফি। আলামত কি? জবাব মিলছে পত্রিকায়। দৈনিক মানবজমিন ১৯ এপ্রিল লিখেছে, রেলওয়ের ৩২ কোটি টাকার জমি উপহার দেওয়া হচ্ছে হেফাজত ইসলাম নেতা শফিকে। হাটহাজারি মাদ্রাসার নামে দুই বছর আগেই জায়গাটিতে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। এখন জায়গাটি আনুষ্ঠানিক বরাদ্দ দেবার জন্যে সরকারের কাছে চিঠি লিখেছেন শফিসাহেব। জানা গেছে, এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে শফিসাহেবের একটা সমঝোতা হয়ে গেছে।জামায়াতের কর্মী হতে হলে মওদুদীর উগ্র ধর্মান্ধ আদর্শে দীক্ষিত হতে হয়, সেভাবে কাজের প্রমাণ রাখতে হয়। এভাবে জামায়াতের আদর্শের সৈনিকরা, যারা নির্দ্বিধায় একাত্তরে মানুষ হত্যা করেছে, লুটপাট অগ্নিসংযোগ করেছে অমুসলমান নাগরিকদের বাড়িঘরে, ধর্ষণ করেছে মা-মেয়েকে একত্রে এবং একাজগুলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েজ বলে যাদের সম্মানিত করা হয়েছে, তারা এখন বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে নতুন জীবন শুরু করবেন? উদ্বেগ ও আশঙ্কা ঘিরে ধরেছে সংখ্যালঘু নাগরিকদের, বিশেষ করে হিন্দুদের। গত এক বছর ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে তাণ্ডবের শিকার হয়েছেন হিন্দুরা, এখন দেখছেন এই তাণ্ডবের লোকজন সরকারি দলে, যে দলটিকে ধর্মনিরপেক্ষ চিহ্নিত করে তারা ভোট দিয়ে আসছেন প্রায় পাঁচ দশক ধরে। সব দেখেশুনে এক ধরনের হতাশা তৈরি হচ্ছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে, কী করবেন তারা। বিএনপি-জামায়াত ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমে বদ্ধপরিকর, ২০০১ সালে নির্বাচনের পর সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের চেহারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্মৃতিতে এখনো দুঃস্বপ্ন ছড়ায়। হিন্দুরা সেই একই নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি দেখে আসছেন গত এক বছর ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে। স্বাভাবিকভাবে বিএনপি-জামায়াত নাম শুনলেই উদ্বেগ-আতঙ্কে আঁতকে ওঠে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। এখন আওয়ামি লিগও সেই কাতারে নেমে আসছে। গত কয়েক মাসে সাম্প্রদায়িক হামলা ও বাড়িঘর দখলের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার অন্তত ষাটভাগ ঘটিয়েছে আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা।

বিএনপি-র স্থপতি জিয়াউর রহমান সংবিধান ইসলামিকরণ করতে গিয়ে সূচনায় বিসমিল্লাহ যোগ করেছিলেন। দেশের সকল নাগরিককে তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে সংবিধান শুরু করতে বাধ্য করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মূল নীতি থেকে বিতাড়ন করেন। এরশাদ সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন। যে রাষ্ট্রে মুসলমান ছাড়াও হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ধর্মের অন্তত দুই কোটি মানুষ বাস করেন সে রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম। শেখ হাসিনা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় মূল নীতিতে ফিরিয়ে আনলেন, কিন্তু বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম অটুট রেখেছেন। হেফাজতে ইসলাম ১৩ দফা দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, যার অধিকাংশ দাবিই দেশকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। যেমন নারীরা পর্দা রক্ষা করতে ঘরে থাকবেন, চাকরি-বাকরির প্রশ্নই ওঠে না। দেশে কোনো মূর্তি থাকবে না, মূর্তিপূজা বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি। আওয়ামি লিগের সঙ্গে এই হেফাজতে ইসলামের সখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হেফাজত নেতারা বলছেন, আওয়ামি লিগের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে, দাবি মানতেও সম্মত হয়েছে। আওয়ামি লিগের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের অপরাধের সংখ্যা বেড়ে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এক সময় বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সমস্যা পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত সীমিত ছিল। কিন্তু এখন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশেও বহু সংখ্যায় অনুপ্রবেশকারীরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছে এবং সেখানে সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশী মুসলমানরা কেবল ভোপাল ও ইন্দোরের মতো মহানগরগুলিতে তাদের জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে তাই নয়, সেখানের গ্রামাঞ্চলেও বসবাস শুরু করেছে। তারা এখন স্থানীয় সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িয়ে নারী পাচার করতে শুরু করেছে। এবছরের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইন্দোর আদালত দুই বাংলাদেশী মহিলার দশ বছর কারাদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করেছে যারা এক নাবালিকা মেয়েকে ফুসলিয়ে এনে দেহব্যবসার কাজে লাগিয়েছিল। আদালতের তথ্যে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা মেয়ে কলকাতার পার্শ্ববর্তী কোনো জেলার। বাংলাদেশী দুই মহিলার নাম রোহিয়া ও মরিয়ম। তারা মূলত বাংলাদেশের যশোর জেলার কোশরবাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এরা দুজনেই ওই মেয়ের বাড়ির পাশেই থাকতো। কাজের সূত্রে ওই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমায়। মুম্বাইতে ভালো চাকুরি পাইয়ে দেবার নাম করে ওই মেয়েকে মুম্বাই-এ এক সংস্থায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে ওই সংস্থা তাকে দেহব্যবসায় লাগায়। ওই নাবালিকা মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও কোনোক্রমে পালিয়ে ইন্দোর পৌঁছয়। ইন্দোরে তার দিদির বাড়ি। পালিয়ে যাওয়ার খবর পাচারকারী দুই মহিলার কাছে পৌঁছে দেয় মুম্বাই-এর ওই সংস্থা। সঙ্গে সঙ্গে দুই মহিলা ইন্দোর পৌঁছে সেই মেয়েকে নিয়ে আবার মুম্বাই রওনা হয়। এই ঘটনা এ বছরের ৪ জানুয়ারি। কান্নাকাটি করা মেয়ের সঙ্গে দুই মহিলাকে দেখে রতলাম স্টেশনে সহযাত্রীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ওই নাবালিকা-সহ দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে ইন্দোর আদালতে পেশ করে। মাত্র প্রায় চার মাসের মধ্যেই মামলার নিষ্পত্তি হয়। বিচারপতি প্রিয়দর্শন দাস ওই দুই মহিলার দশ বছরের জেলের শাস্তি ঘোষণা করেন। নাবালিকা মেয়েকে তার মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মেয়ে পাচারকারী দুই বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে।

নাবালিকা মেয়ের সাহস ও সহযাত্রীদের সহযোগিতায় এবং ইন্দোর-মুম্বাই-কলকাতা পুলিশের তৎপরতায় এরকম একটি মামলা খুব কম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হলো। কিন্তু ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের সাত হাজার মেয়ের হারিয়ে যাওয়ার এফ আই আর বিভিন্ন থানায় করা আছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই নাবালিকা মেয়ে। তিন হাজার মেয়ের এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবরই পাওয়া যায়নি। দিল্লী, মুম্বই বা অন্য মহানগরে বাড়িতে বাড়িতে পরিচারিকার কাজ অথবা দেহব্যবসায় লাগানোর পিছনে বাংলাদেশী নাগরিকরাই যুক্ত— এই তথ্য পুলিশের হাতে আছে।

বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা শুধুমাত্র ভারতের শহরে শহরে অপরাধমূলক কাজকর্ম বা রোজগার করছে তা নয়, দেশের একেবারে গ্রামীণ এলাকায়ও বসতিস্থাপন করেছে। আর ভোটলোভী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চলেছে। প্রথমে দিকে এই অনুপ্রবেশকারীরা কোনো কোনো মসজিদে আশ্রয় নিয়েছে এমনও তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। এক তথ্য অনুসারে মধ্যপ্রদেশে এই অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও বেশি। এরা সেখানে বাংলাদেশী নাগরিক হিসাবে পরিচয় না দিয়ে পশ্চিমবাংলার বাসিন্দা হিসাবে পরিচয় দেয়। এরকম তথ্য সামনে এসেছে যে, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, দিল্লী অথবা অন্য প্রদেশে যাওয়া অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা সরাসরি ওখানে যায় না, ভারতে অনুপ্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গে কোথাও বেশ কিছুদিন বসবাস করার পর যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের পাঠানোর একটা বড় চক্র পশ্চিমবাংলায় কাজ করছে এ তথ্যও গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে আছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ২৩ জেলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য করার পর মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, দিল্লী প্রভৃতি রাজ্যকে টার্গেট করে জনসংখ্যা বাড়ানোর কাজ করে চলেছে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি ও সরকারের উদাসীনতার ফলেই আজ ভারতের হিন্দুসমাজের মেয়ে-বউদের অপহরণ করে দেহব্যবসায় লাগানোর কাজে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা উৎসাহ পাচ্ছে। ইন্দোরের এই ঘটনা রেলযাত্রীদের সচেতনতার জন্য পুলিশের হাতে আসে ও আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এরকম কত ঘটনা লোকচক্ষের আড়ালে ঘটে চলেছে ও কত অসহায় মা-বোনকে নারকীয় জীবনযাপন করতে বাধ্য করছে তার হিসাব নেই।

এবারের নির্বাচন মানুষ বহুদিন মনে রাখবে

শ্যামল কুমার হাতি॥ গত ১২ মে বিকালে শেষ হয়েছে দীর্ঘ ৩৫ দিনের টানা নির্বাচন। ২০১৪-র লোকসভার নির্বাচন সমাপ্ত। এই নির্বাচন মানুষ বহুদিন মনে রাখবে। আগামীদিনে এই নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করবে।

এই নির্বাচনে মুখ্য নির্বাচনী কর্তা সম্পত কুমারের টিম অনেকগুলি কাজ করেছেন। বৃহৎ সংখ্যক নির্বাচককে ভোট দেওয়ার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। তবে তাঁর এই কাজকে দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দলও বিশেষ ভাবে প্রচার করেছে। বিশেষ করে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন চেয়ে বিজেপি এবং তার প্রধান শ্রীনরেন্দ্র মোদী সবাইকে ভোট দান করার কথা বলেছেন। সেই হিসাবে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত সার্থক। এবারে মহিলা ও যুব ভোটদাতাদের যোগদান আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই নির্বাচনে বহু হাজার কোটি টাকা যেমন খরচ হয়েছে তেমনি নির্বাচন কমিশনের লোকজন গোটা দেশ থেকে ৩১৩ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। ওই টাকা নির্বাচনের কাজে অবৈধভাবে লাগানো হোত।

নির্বাচন কমিশন বেনারসের বিজেপি প্রার্থীকে যে স্থানে নিরাপত্তার জন্য সভা করতে দেননি সেখানে কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধীকে এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে রোড শো করতে দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। বেনারসের মানুষ তাঁকে কি চোখে দেখেছে ফল বেরোনোর পরই প্রকাশ পাবে। গত ১১ মে বেনারসের বিজেপি কার্যালয়ে বেনারসের রিটার্নিং অফিসার বিনা কারণে রেইড করে কিছু প্রচার সামগ্রী তুলে নিয়ে যান। পরে বিজেপি নেতাদের প্রতিবাদে ওখানকার রিটার্নিং অফিসার নিজের মুখ পুড়িয়ে বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রী ফেরত দিয়ে গেছেন। একজন প্রার্থীকে হারাবার জন্য কেউ গিয়েছিল দিল্লী থেকে, কেউ বা নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যাকারীর সাহায্যও ভোটের লোভে নিয়েছেন। বেনারসের সঙ্গে সঙ্গে সারাভারত তা দেখেছে। সব উত্তর পাওয়া যাবে ফল প্রকাশের পর।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যারা ২০১১ সালে ‘বদলা নয় বদল’ চেয়েছিল, তারাই রাজ্যের ১৭টি আসনে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে মানুষকে দেয়নি। উত্তর কলকাতায় প্রদত্ত ভোটের হার সব থেকে কম ৬৪.৬৬ শতাংশ। দক্ষিণ কলকাতায় একটা ভয়ের পরিবেশ ছিল। সমস্ত সংবাদপত্রে তার ছবি বেরিয়েছে। শুনশান কলকাতা, রক্তাক্ত কলকাতা, আক্রান্ত কলকাতা। ভীত অবর্জাভার নিজের প্রাণ সামলাতে ব্যস্ত। আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলা, গুলিবিদ্ধ মহিলা, সাত বছরের শিশু সন্তানের ভয়ার্ত ছবি। সবই সংবাদপত্রে আছে। বিজেপি-র মহিলা প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনাদেবী পুরোহিত বোমায় আক্রান্ত। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাওয়া। তারপরও রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। শিষ্টাচার তো নেইই মিথ্যা বলতেও জুড়ি মেলা ভার। তাইতো বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুধীর কুমার রাকেশ বলেছেন— ‘‘বিহারেও এমন নির্বাচন হয় না।’’ যদিও তাঁর ভূমিকাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

আসলে আলিমুদ্দিনের ভোটবাবুদের তৈরি করা ভোটের থিসিসগুলো চুরি হয়ে গেছে। ওগুলো এখন কালীঘাটের ভোটবাবুদের হাতে। ওরা সবাই খুব ভালছাত্র। তারা ভাল ভাবে পড়েই ভোটযুদ্ধে নেমেছে। কে পারবে ওদের সঙ্গে? এখন যারা সিপিএম বামফ্রন্ট করেন তাঁদের আর ওসব জ্ঞান নেই। কংগ্রেস-বিজেপি সংগঠন না করে নির্বাচনের সময় মাঠে নামে। কি করে পারবে ওদের সঙ্গে? এ বাংলায় যদি নিরপেক্ষ ভোট করাতে হয় তাহলে আগে ওই ‘থিসিস’— প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভাষায় সায়েন্টিফিক রিগিং আয়ত্ত করে ফেলতে হবে। আগে ব্যাঙ্কে কমপিউটারে একটা প্যাকেজ ছিল। যখন অনলাইন হলো তখন ওই পুরানো প্যাকেজ ভুলে নতুন প্যাকেজে কাজ করতে হোত। এটাই সিস্টেম। বাংলা ৩৪ বছরের নোংরা, অপদার্থ বামফ্রন্টকে নির্বাসন দিয়েছে। এবার সময় এসেছে এই ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের বিদ্যা নিয়ে যারা চলছে তাদেরও নির্বাসনে পাঠানো। ভোটদান সবার অধিকার। কেউ কাউকে আটকাতে পারে নাকি? তবু জোর করে যারা এই কাজ করছে তাদের সম্বন্ধে তো এবার ভাবতে হবে।

আজ যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের লোকে ভয়ে ভক্তি করে। দেশের স্বার্থে যাঁরা কাজ করে তাঁরা তো মানুষের শ্রদ্ধা পান। তা হলে রাজনৈতিক নেতাদের সেই শ্রদ্ধার ভাঁড়ার শূন্য কেন? রাজনীতির নামে পকেট ভারী করলেই মানুষ বুঝতে পারবে। মানুষের ঘৃণা ঝরতে বাধ্য। এবার দেশে পরিবর্তনের নির্বাচন হয়েছে। মানুষ এবার শুধু শাসকের পরিবর্তন চায়নি, রং-এরও পরিবর্তন চায়নি, মানুষ চেয়েছে— চিন্তার পরিবর্তন, চেয়েছে ভাবনার পরিবর্তন। চেয়েছে সংস্কারের পরিবর্তন। দেশের মানুষ আশা করে দিল্লীর নতুন সরকার সেই ভাবেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। যুবসমাজ তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তারই পাশে দাঁড়াবে।

নেত্রদান মহাদান

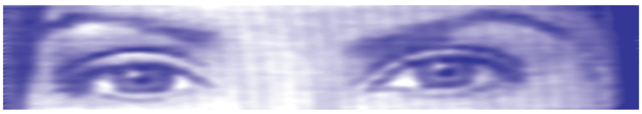

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

রাম মুসলমানদেরও শ্রদ্ধেয় : নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিখ্যাত উর্দু কবি আল্লামা ইকবাল-এর এক জনপ্রিয় শায়েরি 'হ্যায় রাম কে ওয়াজুদ পে হিন্দুস্থান কো নাজ/ আহলে নাজার সমঝতে হ্যাঁয় উনকো ইমাম-ই-হিন্দ'। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য ভারতবর্ষে গর্বিত / জ্ঞানী লোকেরা তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপুরুষ বলে স্বীকার করেন। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে নরেন্দ্র মোদীর জনসভার মঞ্চে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি থাকায় নির্বাচন কমিশনের তরফে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করায় বিজেপি-র তরফে ফৈজাবাদ জেলা প্রশাসনের কাছে জবাবে ইকবালের এই শায়েরির উল্লেখ করা হয়েছে। বিজেপি বলেছে, রাম কোনো ধর্মমত বা জাতপাতের সঙ্গে যুক্ত নন, তিনি একজন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পুরুষ। শুধু তাই নয়, মূল ভারতীয় সংবিধানে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের ছবিও রয়েছে।

ফৈজাবাদের বিজেপি প্রার্থী লালু সিং-এর নির্বাচনী সভার মঞ্চে রামমন্দির-সহ শ্রীরামের বিশাল চিত্র ছিল। ফৈজাবাদে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদী ওই মঞ্চ থেকে বেশ কয়েকবার শ্রীরামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন। বিজেপি-র বক্তব্য, মঞ্চে যে রামমন্দিরের ছবি ছিল তা শিল্পীর কল্পনার প্রকাশ যা ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া-সহ অনেক মুসলিম দেশেই রামলীলা খুব জনপ্রিয়।

ফৈজাবাদের আর ও তথা জেলাশাসক ইন্দ্রবীর সিং যাদব জানিয়েছেন, বিজেপি প্রার্থীর প্রত্যুত্তর খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চলেছে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তানকে আবারও সীমা অতিক্রম করতে দেখা গেল। এই নিয়ে গত ২৬ এপ্রিল থেকে ৪ মে মধ্যে তিনবার গুলি চালানোর মতো ঘটনা ঘটল। তবে ভারতের নিরাপত্তা দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, দক্ষিণ ভারতে একটি ছোট জিহাদি গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যারা খুব কম সময়ের মধ্যেই কাজ করে চলেছে।

২৯ এপ্রিল চেন্নাইয়ের ট্রেনে যে জোড়া বিস্ফোরণ হয়েছে তা বিস্ফোরণের আগে মহড়া হয়ে গিয়েছিল। আবার পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠী জয়েস-ই-মহম্মদে পুনরায় যোগ দিয়েছে মউলানা মাসুদ আজহার। আর যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একের পর এক নাশকতামূলক কাজ শুরু করে দিয়েছে তারা। এমনকী সূত্র মারফত এও জানা যায়, আগামী সপ্তাহে ভারতে নির্বাচনী ফলাফল কি হয় তার জন্য পাকিস্তান এখন থেকে নিজেদের প্রস্তুতি বজায় রাখছে।

মূলত গ্রীষ্মের শেষ দিকে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির শর্তগুলি লঙ্ঘন করে থাকে। এই সময়ই নাশকতামূলক ঘটনাগুলি ঘটে। সম্প্রতি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিশার আলি খান বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী দেশের ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল। আবার পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল রাহেল শরিফ জানান, কাশ্মীর পাকিস্তানের ঘাড়ের শিরা। এ থেকেই স্পষ্ট যে দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক আবারও উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চলেছে।

বিনায়ক সেনের পর আর এক মাওবাদী তাত্ত্বিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি এন সাইবাবা-কে মহারাষ্ট্রের একটি পুলিশ দল গ্রেপ্তার করে মুম্বাই নিয়ে গিয়েছে। সূত্র মোতাবেক, আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনসান অ্যাক্ট (ইউপিএ)-এর ১৩, ১৮, ২০ ও ৩৯ ধারা অনুসারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ছত্তিশগড় থেকে ডাঃ বিনায়ক সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, জে এন ইউ-র ছাত্র হেম মিশ্র-কে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাইবাবার নাম তারা জানতে পারে। সে জানিয়েছে, তারা অধ্যাপক সাইবাবা এবং

জি এন সাইবাবা

ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার অবুজমাড় জঙ্গলের নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠনের ক্যাডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করত। প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, সিপিআই (মাওইস্ট)-এর সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বারদের সঙ্গে দুই পত্রবাহক প্রশান্ত ও চেতনের মাধ্যমে পরোক্ষে তাঁর ধারাবাহিক যোগাযোগ বজায় ছিল। এই সংগঠনের প্রধান সোপাল্লা লক্ষ্মণ রাও ওরফে গণপতির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল এবং এদেশে ও বিদেশে নেতার আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল।

পুলিশের বক্তব্য, সাইবাবা একজন মাওবাদী তাত্ত্বিক নেতা এবং মাওবাদী ফ্রন্ট অরগানাইজেসন রেভ্যুলিউশানারি ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর পথপ্রদর্শক। অভিযোগ— অন লাইন চ্যাট ফোরামের মাধ্যমে তিনি বেনামে মাওবাদীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতেন। যদিও তিনি ও তাঁর পরিবার তা পুরোপুরি অস্বীকার করে বলেছেন, তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ এখন উলঙ্গরাজার দেশ প্রতিবাদ করলে জুটবে মাওবাদী তকমা

গূঢ়পুরুষের কলম

এবার লোকসভার নির্বাচনে একটা কথা অসংখ্যবার শুনেছি। উন্নয়নের গুজরাট মডেল। আমরা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি তাঁদের অনেকেরই এই গুজরাট মডেল সম্পর্কে বিশেষ ধারণা নেই। এই মডেলে উন্নয়নের চেহারাটা কী বা কেমন আমরা জানি না। বিজেপি-র প্রচারেও গুজরাট মডেল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হয়নি। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক বন্ধুদের বলতে শুনেছি, গুজরাট মডেল মানে শিল্পোন্নয়ন। আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন গুজরাট মডেল খারিজ করে দিয়ে বলেছেন এই মডেলে দেশের ক্ষতি হবে। মাননীয় নোবেল জয়ী অধ্যাপক সেন মহাশয়ের মতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে কী গুজরাট মডেলে নরেন্দ্র মোদী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের উপর জোর দেননি। এমন হাজারো প্রশ্ন উঠছে মোদীর গুজরাট মডেলকে কেন্দ্র করে। কট্টর বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতির একজন অধ্যাপক মোদীকে পছন্দ করেন না তাই তাঁর উন্নয়ন মডেলও খারাপ এমনটা ভাবতেও খারাপ লাগে। নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠিত হলে সারা ভারত জুড়ে উন্নয়নে গুজরাট মডেল তিনি অনুসরণ করবেন।

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরবিন্দ পানাগ্রারিয়া এবং অধ্যাপক জগদীশ ভগবতী বলেছেন, গুজরাটের উত্থানের কারণ তার শিক্ষার উন্নয়ন। ১৯৫১ সালে গুজরাটে শিক্ষার হার ছিল মাত্র ২২ শতাংশ। মোদীর নেতৃত্বে গুজরাটে শিক্ষার হার এখন ৮৯ শতাংশ। আশা করা যায় যে আগামী পাঁচ বছরে গুজরাটে ১০০ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত হবেন। গুজরাটের ২০১৩-১৪-র আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেটের পরিকল্পনাখাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ খরচ করার প্রস্তাব করা হয় কর্মসংস্থান ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য। এরপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয় শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি বিদ্যালয়ে নতুন ৫০০০ আসন বৃদ্ধি-সহ ৪৮টি ইংরাজি মাধ্যমের প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়। এর অধিকাংশই ট্রাইবাল এলাকায় হয়েছে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য চিফ মিনিস্টার স্কলারশিপ ফান্ড গঠন করা হয়েছে। তৃতীয় যে বিষয়টির উপর বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। রাজ্যের বাছাই করা ২২টি সরকারি হাসপাতালে স্পেশাল ইনফ্যান্ট কেয়ার এবং নিউট্রিসন কেয়ার ইউনিটস খোলা হয়েছে। গুজরাটের সাধারণ মানুষ এসবই চোখে দেখছেন। মমতার উন্নয়নের বুলি কপচানো সবাই শুনেছেন। কিন্তু সে সব উন্নয়ন নিজের চোখে ক'জন দেখেছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন তিনি নাকি উন্নয়নের বিপুল জোয়ারে পশ্চিমবঙ্গকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। সমস্যা হচ্ছে যে তাঁর স্তাবকবৃন্দ এবং দলের লুম্পেনরা ছাড়া অন্যরা সেই উন্নয়নের বিপুল জোয়ার চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। মমতার দাবি শুনে বহুল প্রচলিত একটা গল্পকথা মনে পড়ছে। কোনও এক দেশের রাজা তাঁর জোচ্চোর স্তাবকদের কথায় বিশ্বাস করে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে রাজপথে শোভাযাত্রা করে চলেছেন। পথের দুধারে দাঁড়ানো প্রজারা সবাই দেখছেন যে রাজা উলঙ্গ। কিন্তু কেউই সাহস করে সেই অপ্রিয় কথাটা বলতে পারছেন না। বললেই গর্দান যাবে। শুধু একটি শিশু হাততালি দিয়ে বললো, 'মা দ্যাখো রাজা ন্যাংটো হয়ে চলেছে'। স্বীকার করতে লজ্জা হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গ এখন উলঙ্গ রাজার দেশ। প্রতিবাদ করলে মাওবাদী তকমা লাগিয়ে গারদে ভরে দেবে। বাঙালি লাল সন্ত্রাস থেকে মুক্তি চেয়েছিল। পরিবর্তে তারা পেয়েছে সবুজ সন্ত্রাস। বাংলার মানুষ এখন পরিবর্তন থেকে পরিত্রাণ চাইছে।

দিল্লীতে সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ এর অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, গুজরাটে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয় সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় 'চিরঞ্জীবী' যোজনায়। গরিব ঘরের প্রসূতিরা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিরঞ্জীবী যোজনায় তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে সন্তান জন্মের খরচ সরকার মেটায়। গুজরাটের সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রথম পাঁচ বছর চুক্তিতে কাজ করতে হয়। ঠিক মতো পড়াতে পারলেই তবে চাকরি পাকা হবে। ঘুষ দিয়ে বা প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষকের চাকরি পেয়ে লাভ নেই। ভাল পড়াতে না পারলে চাকরি যাবে। গুজরাটে প্রাথমিক স্কুলে পঠন-পাঠনের উপর নজরদারি চালাতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী-সহ সমস্ত পদস্থ আধিকারিকদের নিয়মিতভাবে ১৮ হাজার গ্রামের স্কুলে স্কুলে হাজিরা দিয়ে মান যাচাই করতে হয়। পরিদর্শনের সাপ্তাহিক রিপোর্ট খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে জমা দিতে হয়। গুজরাটের শিক্ষার উন্নয়নের এই মডেলের নাম 'গুণোৎসব'। নির্বাচনে অশান্তি, সংঘর্ষ, বোমাবাজিতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অভ্যস্ত। গুজরাটে এখন এসব মোটেই হয় না। এবারের লোকসভার নির্বাচনে গুজরাট একমাত্র রাজ্য যেখানে এক দফায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা হয়েছে। গোধরাকাণ্ড নিয়ে যাঁরা নাচানাচি করেন তাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে নীরব থাকেন কেন? এই সেকুলারবাদীদের জানাই পঞ্চায়েত স্তর থেকেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প আছে। যে গ্রামে টানা তিন বছর কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি সেখানে বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়। একইভাবে যেখানে ঐক্যমতের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত গঠিত হবে সেই গ্রামও বিশেষ সরকারি অনুদান পাবে। এই প্রকল্পের নাম 'পাবন গ্রাম' এবং 'তীর্থগ্রাম'। এটাই গুজরাট মডেল। কিছু না মেনে আলটপকা মন্তব্য করাটা অন্তত অমর্ত্য সেনের সাজে না।

এই ভোটের বড় উপহার রাহুল গান্ধী

মাননীয় সোনিয়া গান্ধী
কংগ্রেস সুপ্রিমো
১০ নম্বর জনপথ, নয়াদিল্লী

ম্যাডাম,

আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আপনার ছেলের সঙ্গে দেশের পরিচয় করার সুযোগ করে দিয়েছেন তাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিজেপি যেমন নরেন্দ্র দামোদর মোদীকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেছেন তেমন ভাবে আপনি রাহুলকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেছেন। তেমন ভাবে আপনি রাহুলকে রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে আসেননি ঠিক কিন্তু গোটা নির্বাচনী প্রচারপর্বে তাঁকে সামনে রেখেই যে কংগ্রেস লড়েছে তা স্পষ্ট। আর সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেছে রাহুল গান্ধী নামক গান্ধীবাড়ির প্রতিনিধি কতটা এলেবেলে।

ছোটবেলায় পাড়ায় খেলার সময় আরও ছোট কোনও ছেলে বা মেয়ে খেলতে চাইলে তাকে আমরা খেলতে নিয়ে নিতাম। কিন্তু সেই সঙ্গে বলে দিতাম ও হচ্ছে এলেবেলে। তার মানে তাঁর ক্ষেত্রে কোনোরকম নিয়ম কানুন কাজ করবে না। ধরা যাক ক্রিকেট খেলা হলে তাঁর ক্ষেত্রে এল বি ডব্লু'র মতো কঠিন আউট নিয়ম কাজ করবে না।

এই নির্বাচনেও নেহাত এলেবেলের ভূমিকায় অভিনয় করে গেলেন শ্রীমান রাহুল গান্ধী। প্রচারের জন্য আর কেউ না থাকায় তিনিই ঘুরলেন। অনেক তেল পুড়ল। লোকও হলো তাঁকে দেখতে। নিষ্পাপ শিশুর মতো তাঁর মুখটি সত্যিই দেখার মতো। হঠাৎ হঠাৎ বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে তাঁকে বিভিন্ন কথাবার্তা বলতেও দেখা গেল। যেন কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী প্রচার নয়, কোনও টিভি চ্যানেলের লোকসভা ভোটের অনুষ্ঠান। যাই হোক কায়দাটি সুন্দর। নিজেদের উদ্যোগে মাল্টি ক্যামেরায় তার সম্প্রচারও করেছে কংগ্রেস। সেসব এখন ইউটিউবে ছড়িয়ে আছে। ম্যাডাম পারলে কয়েকটা দেখে নিন। একটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। এক গরিব রিক্সাওয়ালাকে রাহুল বলছেন, স্বাধীনতার এতদিন পরও জানেন দেশে অনেক গরিব মানুষ আছেন। এক মহিলাকে তিনি প্রশ্ন করে জানতে পেরেছেন ধনীর অনেক টাকা থাকে এবং গরিবের থাকে না। এইবার ভোটের প্রচারে না নামলে রাহুল নাকি এমন বিস্ময়কর তথ্য জানতেই পারতেন না। এমনকী কেরলে না গেলে তিনি জানতেই পারতেন না দেশে জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি। নিজেদের সরকারের আমলে তৈরি হওয়া এই বেহাল দশার জন্য মঞ্চে মঞ্চে বিরোধীদের সমালোচনাও করেছেন। কেন করেছেন? নিশ্চয়ই তিনি জানেন না।

অবস্থা যেমনই হোক এই দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ দল কংগ্রেস। সেই দলের প্রধান মুখ রাহুল গান্ধী। তাঁর ছবি দিয়েই দলের যাবতীয় প্রচার বিজ্ঞাপন তৈরি হয়েছে। তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে কম দিন নন। বছর খানেক হয়ে গেছে সহসভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন। এর আগে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে চেনা এবং জানা হয়ে গেছে। কিন্তু এই নির্বাচন না হলে গোটা দেশের জানাই হোত না যে তিনি এক বিস্ময়। কোন মঞ্চে, কখন কোন কথা তিনি বলবেন, তা আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসেও ইঙ্গিত না পাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো। ভারতের জনসংখ্যা থেকে গুজরাতের আয়তন সব কিছু নিয়েই বিভিন্ন বিস্ময়কর তথ্য তিনি পেশ করেছেন মঞ্চে মঞ্চে। হাসি ও হাততালি দুই-ই কুড়িয়েছেন। আর কংগ্রেস নেতাদের ভাবটা ছিল গান্ধীবাড়ির লোক যখন বলছে তখন গুজরাটের আয়তন আমেরিকা মহাদেশের থেকেও বড় হতেই পারে।

বিভিন্ন টিভি সাক্ষাৎকারেও বসেছেন তিনি। সহাস্য মুখে বসেছেন। কিন্তু যেই মুখ খুলেছেন ব্যাস। কী বলছেন, কী বলছেন না বুঝতে না বুঝতে সঞ্চালকের খেই হারিয়ে যাওয়ার জোগাড়। সব প্রশ্নেই হয় এক উত্তর নয়তো পাল্টা প্রশ্ন। আচ্ছা বেকারত্ব মোকাবিলার জন্য আপনার পরিকল্পনা কী? এমনই সাধারণ প্রশ্ন। রাহুল মিটি মিটি সবজান্তা হেসে প্রশ্নকর্তাকেই উল্টে জিজ্ঞাসা করলেন আগে বলুন আপনি হলে কী করতেন? ২০টি প্রশ্ন করা হলে ১৭টিতে তাঁর উত্তর, নারীর ক্ষমতায়ন ও ব্যবস্থার পরিবর্তন করবেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থার পরিবর্তন করবেন তা জিজ্ঞাসা করে গোটা মিডিয়া ক্লান্ত হয়ে গেলেও উত্তর পাওয়া যায়নি।

কিন্তু ম্যাডাম সোনিয়াজি, আপনার ছেলের ক্ষমতা তো কম নয়। তিনি ইচ্ছে করলে মন্ত্রিসভায় পাশ হওয়া অর্ডিন্যান্স ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, তাঁর এক কথায় এলপিজি-র ভর্তুকি ৩৩ শতাংশ বেড়ে যায়। তবু তিনি চুপ থাকলেই যেন ভাল। আপনার রিমোট চালিত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও চুপ থাকতেই পছন্দ করেন। কিন্তু তিনি মুখ খুললেও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। নীতি যাই হোক তাঁর মতো প্রজ্ঞা সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু সেই মনমোহন সিং যখন রাহুল গান্ধীকেই কংগ্রেস এবং দেশের যোগ্য ভবিষ্যৎ বলে দাবি করেছেন তখন সত্যিই মনে হয়েছে, সিংজী ইউপিএ সরকারের অঙ্গসজ্জা ছিলেন। তখনই মনে হয় মোদীর কথায় দিল্লীর সরকার মা-বেটার সরকার। ম্যাডাম, মায়ের কাছে ছেলে সম্পর্কে এমন বলার জন্য মাফ করবেন। দুঃখ প্রকাশের সঙ্গে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। পারলে ওঁকে একটা একটা 'কমনসেন্স' এর কোর্সে ভর্তি করে দিন।

— **সুন্দর মৌলিক**

মোদী আতঙ্ক কেন এবং কাদের?

দেবীপ্রসাদ রায়

নরেন্দ্র মোদী অজস্র দোষারোপ কুৎসা এবং অপপ্রচারের বাধা ঠেলে জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পর্যায়ে উঠে আসছেন ধীর স্থির কিন্তু এক নিশ্চিত পদক্ষেপে। ঠিক সেজন্যই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে একশ্রেণীর অনৈতিক ভাবে ভোটভিক্ষু ক্ষমতালিপ্সু, জাতীয় স্বার্থরক্ষায় একান্ত উদাসীন এবং জাতীয় স্বার্থ পরম্পরাকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করা দ্বিধাহীন বিকারহীন কিছু মানুষের মধ্যে, ব্যক্তিগত ভাবে এবং গোষ্ঠীগত ভাবে। তাই দেখি দৃশ্যত আদায়কাঁচকলায় সম্পর্ক থাকলেও মোদী বা বিজেপি-কে রুখতে একাট্টা হয়েছে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী দলগুলি এবং যে কোনো মূল্যে ভোট পেতে আগ্রহী অন্যান্য দলও। এদের সঙ্গে আছে তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা যারা আমাদের সংবিধানে প্রয়োজন অনুভূত না হলেও পরবর্তী কোনো এক সময়ে সেকুলার এবং সোস্যালিস্ট শব্দ দুটি ঢুকিয়ে দেশাত্মবোধ সম্পৃক্ত সদ্‌ভাবনা অলঙ্কৃত আমাদের মূল সংবিধানকে যদৃচ্ছ ব্যভিচারের শিকারে পরিণত করছে ও করে চলেছে। মূল সংবিধানে কী ছিল, কেন ছিল— তাকে ভুলিয়ে দেবার জন্য স্কুল-পাঠ্যপুস্তকগুলিতে সংবিধানের উদ্দেশিকার এক বিকৃত রূপ উপস্থাপন বাধ্যতামূলক করেছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছাত্রছাত্রীরা যাতে মূল সংবিধান কী ছিল জানতে না পারে। বিকৃতায়নের পর থেকেই মুসলমানদের সমস্ত গণতন্ত্রবিরোধী কাজ, দাবির দাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষরা নিরাপত্তাহীনতায় এবং সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের জন্য অসাম্যের বলি হচ্ছে, পৃথিবীর কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এভাবে নির্যাতনের সম্মুখীন হয় না। আর্থসামাজিক কারণে দেশের সুস্থিতি বজায় রাখার জন্য পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা— সব্বাই, ভারতবাসী তা মানবে, মুসলমানরা মানবে না ধর্মীয় শরিয়তি আইনের জন্য। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সব ভারতবাসীর জন্য প্রযোজ্য। মুসলমানরা মানবে না শরিয়তি আইনের জন্য। এবং কংগ্রেসী সরকার ভোটের কারণে মুসলমানদের তুষ্ট করতে তাই-ই মানবে। এর ফলে দেশের বহুস্থানে মানচিত্র পাল্টে গেছে, যাচ্ছে। তার ফল কি? পাকিস্তান মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র, সে দেশকে হিন্দুশূন্য করা হয়েছে। বাংলাদেশ মুসলমানপ্রধান রাষ্ট্র তাই হিন্দুশূন্যর দিকে। এমনকী নিজেদের দেশে কাশ্মীরে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য তিন লক্ষ হিন্দু বিতাড়িত। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনা না মানা এবং নিরন্তর অপপ্রয়োগে মুসলমান সংখ্যার বৃদ্ধি এদেশে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে অস্তিত্ব সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কংগ্রেস সরকার এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও অগ্রাহ্য করে মুসলমান তোষণ করে যাচ্ছে। আজ বিজেপি নেতা গিরিরাজের বক্তব্যের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, ভাল কথা! তাহলে কাশ্মীর থেকে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো তার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন?

এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন চাই। জ্বলে পুড়ে থাকা হিন্দুরা একজন শক্ত পক্ষপাতহীন সরকার চায়। আশা, নরেন্দ্র মোদী সে আশা পূর্ণ করবেন আর এতে মুসলমান তোষণকারী কংগ্রেস এবং কিছু রাজনৈতিক দল ও ভণ্ড সেকুলার মানুষ তো আতঙ্কগ্রস্ত হবেই। শরিয়তি আইনমুখী মুসলিমদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে চীন তার দেশবাসীর সুরক্ষার জন্য। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যারা রাশিয়ার আইন মেনে চলবে তারাই রাশিয়ায় থাকবে। শরিয়তবাদীরা অন্যত্র চলে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের সরকার ভোটবাজির জন্য দেশের বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে সুরক্ষা দিতে রাজি নয়। আতঙ্কিত হবে এরাই।

সারাদেশ জুড়ে কংগ্রেস সরকার ও তথাকথিত ভণ্ড সেকুলার প্রগতিশীলরা মূকবধির হওয়ার কারণে সারাদেশ জুড়ে নানা ধরনের অমানুষিক কার্যকলাপে লিপ্ত মুসলমানরা প্রশ্রয়িত হচ্ছে সর্বক্ষণ। মজফ্‌ফরনগরে দাঙ্গা কেন হয়েছিল? গোধরায় দাঙ্গা হয়েছিল কোন নৃশংস ঘটনার প্রেক্ষিতে, কারা ঘটিয়েছিল? কংগ্রেস সরকার ও প্রগতিশীল ভণ্ড সেকুলাররা একটি নিন্দনীয় প্রতিবাদসূচক বাক্য খরচ করেনি, একটি জনস্বার্থ মামলা করেনি কেন? অতীতে কাশ্মীরে 'হজরতবাল' চুরি নিয়ে সারাদেশ দাঙ্গা চালানো হলো। পরে জানা গেল 'হজরতবাল' চুরিই হয়নি। কয়েকজন মসজিদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চক্রান্তে তা করানো হয়েছিল, তাও কমিশন হয়েছিল— তারা শাস্তি পেয়েছিল? 'বন্দেমাতরম্' আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্র ছিল। মুসলিমদের তোষণের জন্য তাদের অপসন্দ সঙ্গীত বন্দেমাতরমের অবমাননা হয় প্রায়ই। একটি উদাহরণ— 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, যাদবপুর'-এর ১৫০ তম বর্ষ উদ্‌যাপনে এসেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল। সমাপ্তি সঙ্গীত হবে 'বন্দেমাতরম্' ঠিক ছিল ইনস্টিটিউশনে পক্ষ থেকে। রিহারসালও হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন রাজ্য সরকারের প্রগতিশীল এবং সেকুলারদের চাপে শেষ মুহূর্তে 'বন্দেমাতরম্' গান বন্ধ করা হয়। এই সব প্রগতিশীলদের কাছে নরেন্দ্র মোদী তো

আতঙ্কের হবেনই। ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে সরকার ধৃতরাষ্ট্র সেজে থেকেছে। দেখেছেন সমস্ত দূরদর্শন খুললেই লোগোর নীচে লেখা থাকে 'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্'। আপনারা কি লক্ষ্য করেছিলেন একসময় মুসলিমদের চাপে তা হয়ে গিয়েছিল 'সত্যম প্রিয়ম সুন্দরম্! কারণ 'শিব' কথাটি ছিল যে! কোনো দেশ, কোনো জাতি এতবড় অবমাননাকর কাজ সহ্য করে? ভারত কিন্তু করে চলছে।

বিখ্যাত মীনাক্ষীপুরম মন্দির নগরী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে হয়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকারের মূক ও বধির ভূমিকায় 'রহমতনগর'। 'মালাপুরম' জেলা নাম্বুদ্রিপাদের মন্ত্রিত্বকালে চিহ্নিত মুসলিম জেলা ও তার ম্যাজিস্ট্রেট হবে মুসলিম। মুসলিম সম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে নিরন্তর জল সিঞ্চন করে গেছে প্রগতিশীল সেকুলাররা। বৃহৎ হিন্দুসমাজের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে— বাবরি ধাঁচা ধ্বংসে তা দৃশ্যমান হয়েছিল। গোধরা পরবর্তী কাণ্ডে আবার তা দেখা গেল। বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের ধৈর্যচ্যুতির কারণগুলি সম্যক উপলব্ধি করেই 'Rediscovery of India'র লেখক একদা পাকিস্তানি ইউ এন প্রতিনিধি আনসার হোসেন খান মুসলিমদের প্রতি লিখেছেন— (Orient Longman)

"Indian Muslims must remember that their forefathers or rather their medieval co-religionist rulers over India were beastly and frightful to the Hindus... Temples were indeed demolished and their stone often used to construct mosques on their very site.:" (প্রসঙ্গ বাবরি মসজিদ)। মথুরায় কৃষ্ণজন্মভূমিতে যাবেন দেখবেন বিরাট এক অংশ অধিকার করে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদ। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে যাবেন— দেখবেন সুবৃহৎ মন্দিরের উপর তলগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে দিল্লী থেকে মোগল সম্রাট সন্ধ্যারতির আলো দেখতে পেতেন বলে। কাশী বিশ্বনাথমন্দির যাবেন— সামনে দাঁড়িয়ে আছে জোর করে প্রতিষ্ঠা করা 'জ্ঞানবাপী মসজিদ'। এসব সত্ত্বেও 'যত মত তত পথ' দর্শনে বিশ্বাসী বৃহৎ হিন্দুসমাজ নতুন করে স্বস্তিতে বসবাস করতে চেয়েছিল যা বিঘ্নিত হয়েছে, হচ্ছে ধর্মান্ধ মুসলিমদের নিরন্তর অন্যায্য দাবির জন্য এবং কংগ্রেসদল ও ভণ্ড সেকুলারবাদের প্রশ্রয়ের জন্য নরেন্দ্র মোদীর উত্থানকে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে থাকা হিন্দুসমাজ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সারা ভারতে এবং তাতে আতঙ্কিত কংগ্রেস এবং তথাকথিত সেকুলাররা।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও এক সময়ে বিরক্ত হয়ে এক মাইনরিটি ডেলিগেশানকে বলেছিলেন "...Minority cannot claim to be secured by constantly irritating the majority." কংগ্রেসী এবং ভণ্ড সেকুলার ও প্রগতিশীলরা আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করে এসেছে বরাবর--- আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মিথ্যা এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত ইতিহাস পড়তে বাধ্য করেছে ও করে যাচ্ছে আমাদেরই করের টাকায়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু কংগ্রেসীদেরই অবদান এই মর্মে ধাতব ফলক রাজঘাটে মাঠের গভীরে প্রোথিত করা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জরুরি অবস্থার সময়। জনতা সরকার এলে তা তুলে ফেলা হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। তবে শর্ত দিয়েছিলেন তিনি বলবেন কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে তা লেখা হবে। রমেশচন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করায় তারাচাঁদকে দিয়ে এক ইতিহাস লেখানো হয় সরকারি খরচে, যা মানুষ গ্রহণ করেনি। এই 'স্বস্তিকা' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষাংশ লেখার জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল বামপন্থী প্রগতিশীল ইতিহাসবিদ যেমন ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার প্রমুখকে। বিপুল পরিমাণ টাকা উধাও হয়ে গিয়েছিল যার জন্য Asian Age 9th August 1998 লিখেছিল--- "The ICHR (Indian Council of Historical Research) has over the years transformed into a vortex into which an increasing number of research work and a spiraling sum of funds regularly vanishes." ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই ICHR-এর সভাপতি হতেন প্রগতিশীল সেকুলার মার্কসিস্ট ইতিহাসবিদরা, যেমন ইরফান হাবিব হয়েছিলেন চারবার। আমেরিকা ও ফ্রান্সের উপগ্রহ মারফত যখন রাজস্থানের মরু গভীরে একটি নদীর খাদের চিহ্ন পাওয়া গেল এবং স্থলভাগে সেই চিহ্নিত খাতের প্রায় ২৫০০ নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল তখন গবেষক ঐতিহাসিকরা বিশ্ব জুড়ে সরস্বতী সভ্যতা বলে তাকে অভিহিত করলেন— যখন সেই গবেষণার কাজে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা বার্ক (BARC)-সহ, ISRO-সহ সরস্বতী নদীর বাস্তবতার ইতিবাচক দিকগুলি প্রকাশ করলেন যে কাজের সূচনা ১৯৪২ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ওরেসস্টাইন করেছিলেন, তাকে নস্যাৎ করে প্রগতিশীল সেকুলার ইরফান হাবিব তাঁর একটি পুস্তকে লিখেছেন (ভাষান্তর) "...মহতী সরস্বতী নদী'— যার আজ কোনো অস্তিত্বই নেই— তার স্রোতপথ অনুসরণের শ্রমসাধ্য বিস্তৃত প্রয়াস এই সিদ্ধান্তকেই সামনে নিয়ে এসেছে যে ওই নদী কোনোকালেই ছিল না। অর্থাৎ সরস্বতী নদীর মাহাত্ম্য সংক্রান্ত সমস্ত বক্তব্য এবং দাবিই আকাশকুসুম কল্পনাপ্রসূত, অথচ ISRO, BARC... রিপোর্ট দেখুন, কীভাবে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। Internet দেখুন— বদ্রীনাথের ১৬ কিলোমিটার দূরে মানাগ্রামে তীব্র গর্জনে সরস্বতী বেরিয়ে আসছে এবং অলকানন্দায় পড়েছে। ভিডিওতেই এত গর্জন যে বিশ্বাস করাই মুশকিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা অবশ্য সমর্থন করেন। রাজস্থানে মাটির গভীর থেকে ৬ হাজার বছরের পুরানো স্বাদু সুপেয় জল তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী এলে এই সব সেকুলার প্রগতিশীল মার্কসিস্টদের খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন বন্ধ হবে। সুতরাং আতঙ্ক তো হবেই।

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের পদার্থবিভাগের প্রাক্তন প্রধান)

মোদীর ভারত ভাবনা

তারক সাহা

নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় জনতা পার্টির ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। ২০১৪ ভোট অঙ্গনে সবচেয়ে চর্চিত নাম। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ৬৭ বৎসরের ইতিহাসে এমন তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণের কাউকে মোকাবিলা করতে হয়নি। তবুও মোদী অপ্রতিরোধ্য। কারণ ভারতবর্ষের আম আদমি তাঁরই পিছনে। সাড়ে তিন লক্ষ কিলোমিটার চষে বেড়ানো এই নেতা যেখানেই গিয়েছেন উপচে পড়া জনতা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে, তাঁর মুখের কথা শুনতে চেয়েছে। মোদী এমন এক নেতা যিনি গুজরাটের মতো গোটা দেশকে উন্নয়নের মোড়কে মুড়ে ফেলতে চান। তাঁর এই রূপায়ণের আলেখ্য শুনতে চান ১৮ থেকে ২৮ বছরের তরুণ-তরুণীরা যাঁরা স্বপ্ন দেখেন কাজের। যাঁরা আগামী দিনের ভারত নির্মাণের প্রতিভূ। মোদী বলেছেন কংগ্রেসকে আপনারা দীর্ঘ ৬০ বছর দিয়েছেন, তিনি চেয়েছেন মাত্র ৬০ মাসের সময়।

২০০৪ এবং ২০০৯-তেও ২০১৪-র মতো বিজেপি স্বপ্ন দেখেছিল ক্ষমতা লাভের। বাস্তবে তা ঘটেনি। কিন্তু এবারে ২০১৪-তে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপক হারে। একটা দুটো নয় যেখানে মোদী গিয়েছেন সেখানেই মানুষের উপচে পড়া ভিড় সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের ঈর্ষার কারণ। নির্বাচনের আগে দেশ জুড়ে ২৫টি ছোট-বড় দলের সঙ্গে জোট হয়েছে। কংগ্রেসের তাবড় নেতারা এবারে স্রেফ হেরে যাবার ভয়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে চাননি। মানুষের উৎসাহ এবারে এতটা যা এক কথায় অভূতপূর্ব।

জাতীয় পরম্পরা ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হয়েও ভারতীয় সংস্কৃতি, বিকাশ ও জাতীয় স্বাভিমান— এই তিন ভাবনার সমন্বয় সাধনাই মোদীর ভারত-ভাবনার সূত্র। তিনিই বলেছেন— ভারতই প্রথম— ইন্ডিয়া ফার্স্ট। গুজরাটের উন্নয়ন মডেলকে শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। সারা বিশ্বের কাছে— ট্র্যাডিশন, ট্যালেন্ট, টেকনোলজি, ট্যুরিজিম ও ট্রেড-এর মাধ্যমে আমাদের দেশের অগাধ ঐশ্বর্যগুলিকে তিনি তুলে ধরতে চান। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি আকৃষ্ট হবে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর সোনালী চতুর্ভুজ সড়ক নির্মাণের মতো দেশের চার প্রান্তের শহরগুলির মধ্যে কম সময়ে যাতায়াতের জন্য তিনি চান বুলেট ট্রেন। ক্রমবর্ধমান শহরমুখী জনসংখ্যার জন্য তিনি চান সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত পরিবেশ বান্ধব ১০০টি শহর নির্মাণ। মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে একটি কেন্দ্রীয় সরকার পেতে দেশবাসী আজ প্রস্তুত।

মোদীর কাছে মানুষের প্রত্যাশা যে অপরিসীম তা তিনি জানেন। দেশ জুড়ে গত দশ বছরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে যে হতাশা, নিরাশাব্যঞ্জক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তাঁর দল সেক্ষেত্রে মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। মানুষের মনে যে আশা উঁকি দিচ্ছে তাতে তিনি উৎসাহিত। আর এই কারণেই অর্থনীতি, পরিবেশ, প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, বিদেশনীতি--- বিশেষত, পাকিস্তান, চীন ও আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক, মুসলমান সমাজ, সিবিআই প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি তাঁর ভাবনা-চিন্তা ব্যক্ত করেছেন।

মুসলিম সমাজ

বিগত ষাট বছরে কংগ্রেস-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমান ও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ভিত্তিতে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে এসেছে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বিজেপি সম্পর্কে আতঙ্ক তৈরি করেছে। কিন্তু দেশের মুসলমানরা বিজেপি-র উত্থানে আদৌ ভীত নয়। তাদের মধ্যে মোদী আতঙ্ক তৈরি করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে না। সংখ্যালঘু অনেক বিশিষ্ট নেতার মুখে শোনা যাচ্ছে যে, উন্নয়নের কাজ না করে কংগ্রেস কেবল জাত-পাতের রাজনীতি করে ভোটে ফায়দা তুলতে চাইছে। গত ৬০ বছরে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি যেভাবে দেশের ক্ষতি করেছে তা অন্যভাবে ঘটেনি। বিজেপি-র স্লোগান হলো--- 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। বিজেপি বিশ্বাস করে উন্নয়নের, সুশাসনের, জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে সকলের বিকাশ সম্ভব।

সি বি আই

সিবিআই-কে ইউপিএ সরকার কাজে লাগিয়েছে মোদীকে হেনস্থা করতে। গত দশ বছরে সরকার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে, সিবিআই-কে ব্যবহার করেছে। সিবিআই কীভাবে কাজ করে তা শোনা গেছে দেশের

উচ্চতম আদালতের তিরস্কারে। মোদী প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করেন না। গত দশ বছরে সিবিআইকে দিয়ে যে ভুল-ত্রুটি করিয়েছে সরকারে এলে তা শোধরানো হবে। কেবল রাজনৈতিক ফয়দা লুটার কাজে সিবিআইকে কাজে লাগানো হবে না। কেউই আইনের সুবিচার থেকে বঞ্চিত হবে না। কোনো অপরাধীর আইনের হাত থেকে মুক্তি নেই। এমনকী সেই অপরাধী যদি মোদীও হন।

নকশাল আন্দোলন

নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে মোদীর সোজাসাপটা জবাব হলো যে, নকশাল তথা মাওবাদী আন্দোলন নিশ্চিতভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে এক বড় বিপদ। এই সমস্যা সম্পর্কে মোদীর ভাবনা হলো যে, এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র আপোস করা উচিত নয়। এই চ্যালেঞ্জকে প্রতিহত করতে খোলা নীতি গ্রহণ করে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাকে আরও বলবান করতে হবে। কোনও ভাবেই, কোনও কারণেই এই সমস্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতির খামতি থাকলে চলবে না।

প্রসঙ্গ কংগ্রেস

কংগ্রেস প্রসঙ্গে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর মত হলো— কংগ্রেস এখন এক অবক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি। নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে কংগ্রেস এবার ব্যস্ত। এই লড়াইয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধী পরিবারের প্রতি নেতাদের আস্থা টলে গেছে। তাদের লক্ষ্য হলো যে কোনওভাবে একশ-র অধিক আসন লাভ করা। মোদীর ধারণা এবারে তা সম্ভব হবে না এবং তা না হলেই গান্ধী পরিবারের নেতৃত্বের ওপর প্রশ্ন চিহ্ন ঝুলবে।

বিদেশী নীতি

বিদেশ নীতি প্রসঙ্গে সবার আগে উঠে আসে পাকিস্তান। বাজপেয়ী জমানায় শান্তি প্রক্রিয়াকে ভেস্তে দেয় পাকিস্তান কার্গিল লড়াই শুরু করে। পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে তাঁর নীতি নিয়ে মোদীর বক্তব্য— পাকিস্তান যদি দ্বিপক্ষিক সমস্যা সমাধানে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে তবে অতীতের কোনো ঘটনা সমস্যা সমাধানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। যাই হোক, পাস্পরিক বিশ্বাস অর্জন প্রধান অন্তরায়। আর তার পূর্ব শর্ত হলো পাকিস্তানে অবস্থিত সব রকম সন্ত্রাসবাদী কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে।

বাস্তব হলো, পাকিস্তানে চলছে ত্রি-স্তরীয় ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপ। আর যখনই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া চলে ঠিক তখনই সেদেশে বড় হয়ে উঠে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা। এই বিষয়ে মোদী সতর্ক কিনা জানতে চাওয়া হলে মোদীর উত্তর— 'এর জন্য চাই বাস্তব বিদেশ নীতি। যে কোনও নীতি গ্রহণের আগে বাস্তব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে হবে। তাঁর মতে পাকিস্তানি জনতা চায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রগুলি আরও শক্ত হোক। দায়িত্ববান বিশ্বের সদস্য হওয়ায় দরুন এই প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানকে সহযোগিতার হাত আমরা বাড়িয়ে দেব।'

২০০২-এ দাঙ্গার পরও চীন গুজরাটে লগ্নী করেছে যা আমেরিকা করেনি। এই সম্পর্ক দিয়ে জাতীয় স্তরের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এই সম্পর্ককে অন্যস্তরে নেওয়া যেতে পারে। যদি ভারত ও চীন নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে সম্পর্ককে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় তবে দু দেশের পক্ষে তা মঙ্গলময়। কারণ একবিংশ শতক হচ্ছে এশিয়াবাসীদের জন্য, কেননা দুনিয়ায় ষাট শতাংশ মানুষ এশিয়াবাসী।

গুজরাটের এক জনসভায় মুসলিমদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়।

দুনিয়ার মঙ্গলের স্বার্থেই এশিয়ায় উন্নয়ন দরকার এবং এশিয়াবাসীদের জীবনযাপনের উন্নয়নের প্রতি দৃকপাত করা জরুরি।

মার্কিনী ভিসা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মোদীজী বলেন, আগেই অনেকবার উনি বলেছেন যে, ছোটখাটো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দুই দেশের সুসম্পর্কের পথে অন্তরায় হওয়া উচিত নয়, বাজপেয়ীজীর সরকার দুই দেশের সম্পর্কে নতুন জোয়ার এনেছিল। তাঁর সরকার সেই সম্পর্কের রেশ আরও বহুদূরে নিয়ে যেতে চান। দুনিয়ায় প্রবীণতম গণতন্ত্র এবং বৃহত্তম গণতন্ত্র দুটি দেশ হলো স্বাভাবিক বন্ধু এবং এই দিশায় একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

মিডিয়া

মিডিয়া প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ। আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে মিডিয়া হবে শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ। গণতন্ত্র এবং মিডিয়া একে অপরের পরিপূরক। মিডিয়ার ওপর মোদীর আস্থা প্রবল এবং সম্মানও করেন। কিন্তু মোদীজীর মতে কিছু মিডিয়া কয়েকটি ইস্যুতে অন্ধ এবং এতটাই অন্ধ যে তারা সত্যটা দেখতে পায় না। গণতন্ত্র প্রসারে এদের ভূমিকা খুবই নেতিবাচক। সবচেয়ে খারাপ হলো এ ধরনের মিডিয়া কিছু স্বার্থান্বেষী চক্রের পৃষ্ঠপোষক, এরা প্রায়ই সত্যের অপলাপ করে এবং মিথ্যাকে জনসমক্ষে প্রচার করে।

তিনি মনে করেন, মিডিয়ার মানুষজন প্রাতিষ্ঠানিকরূপে এসব প্রতিহত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়কের ভূমিকা নেবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকের নিজস্ব মতামতকে ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু যখনই এ বিষয়ে মতান্তর, মনান্তর ঘটে, যেখানে আইনের প্রসঙ্গ ওঠে, সেখানেই সামগ্রিকভাবে বিষয়গুলি বিচার-ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমাদের উচিত একে সম্মান প্রকাশ করা। এইভাবে আমরা আমাদের মনে যে বিতর্ক তৈরি হয় তার সমাধান মিলবে।

প্রসঙ্গান্তরে মোদী বলেছেন যে ইতিমধ্যেই তিনি মিডিয়া সম্পর্কে তাঁর অভিমত পেশ করেছেন। তিনি চান না মিডিয়াকে প্রভাবিত করতে, আবার তিনি এমন ব্যক্তি নন যে, মিডিয়া দ্বারা তিনি আঘাত পান, আহত হন। তিনি সর্বদা মনে করেন যে, তিনি তাঁর কাজ করে যাবেন এবং মিডিয়াও তার স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করুক সদর্থক উপায়ে। মিডিয়া যেমন তাঁর মতাদর্শকে সম্মান দেবে তেমন মিডিয়ারও প্রত্যাশা রয়েছে রাজনীতি ও সরকার তাদেরও সসম্মানে কাজ করতে দেয়।

ফিকি-র সভায় আলোচনারত মোদী।

প্রতিরক্ষা

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মোদীজী বলেছেন যে, আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রতিটি সদস্য উদ্দীপনা এবং সাহসের সঙ্গে কাজ করেন। আমাদের ভূমি এবং সীমান্তরক্ষা করতে তাঁদের বলিদানকে দেশ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তাঁদের এই সাহসী বলিদানের প্রতি দেশ কৃতজ্ঞ। ঐতিহাসিক সত্য যে, আমরা কখনই কাউকে আক্রমণ করিনি, কিন্তু আক্রান্ত হলে আমরা তার যুৎসই জবাব দিয়েছি। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করতে, যে কোনও আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে অবশ্যই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে জওয়ানদের মনোবল অটুট থাকে। এজন্য সরকারকে এই দিশায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে আমাদের অফিসার ও জওয়ানদের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে।

গত এক দশকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সামরিক প্রস্তুতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ অস্ত্র কিনতে দীর্ঘ সময় লাগছে। সেইসঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহে দুর্নীতি রয়েছে। আদর্শ অবস্থান হলো তৎপরতার সঙ্গে দুর্নীতি মুক্ত, উচিত দামে সামরিক সরঞ্জাম কেনার চটজলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই এক দশকে কখনই সময় মতো সরঞ্জাম কেনা হয়নি। তবুও এসকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এখন সময় এসেছে সামরিক সরঞ্জাম দেশেই উৎপাদন হোক যেখানে তার গুণগত উৎকর্ষ বজায় থাকবে এবং দরকার মতো আমরা আমাদের অস্ত্র উৎপাদন খুব কম সময়েই করে নিতে পারব। সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দেশীয়করণ করতে হবে। ডি আর ডি ও-র কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সামরিক সরঞ্জাম কেনার জন্য আমরা এখনও পরনির্ভর। আমাদের যথেষ্ট বিজ্ঞানী এবং কারিগরি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অস্ত্রচক্র সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের স্বনির্ভর করে তুলতে হবে যাতে মহার্ঘ বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় হয়।

অর্থনীতি

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোদী বে-রোজগারের কথা তুলছেন, বে- রোজগার ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ইস্যু। এক্ষেত্রে ১৮

মিডিয়ার সামনে মোদী।

থেকে ২৮ বছরের যুবক-যুবতীদের হাতে সত্বর কাজ জোগাড় করে দেওয়া এক বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেছেন যে, এনডিএ-র ছয় বছরের জমানায় যেখানে ৬ কোটি

ইণ্ডিয়া টিভি-র 'আপ কি আদালত'-এর মোদী।

কর্মসংস্থান হয়েছিল, সেখানে দীর্ঘ এক দশকে মনমোহন সরকার মাত্র দেড় কোটি কাজের ব্যবস্থা করেছে।

'ক্ষমতায় এলে কর্মসংস্থান হবে পাখির চোখ। এক্ষেত্রে মেকি উন্নয়নের কথা বললে চলবে না, যে উন্নয়ন কাজ তৈরি করে না। আমি যুবকদের ব্যথা যন্ত্রণা বুঝি'। এ অবস্থা তৈরি হয়েছে কেবল ১০ বছরের হতাশা থেকে। এই যুবক-যুবতীর মধ্যে নিরাশার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে আমাদের নেতিবাচক ট্র্যাক রেকর্ড থেকে। মোদী মনে করেন দেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণী মেধাসম্পন্ন, কর্মক্ষম এবং এদের স্বপ্ন রয়েছে। তাদের অধিকার রয়েছে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ গড়ায়। আমাদের দায়িত্ব হলো সঠিক শিক্ষা এদের দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যে এদের প্রত্যেকেই কর্মক্ষম হয়। আমরা এদের চাহিদা বুঝি এবং তাদের স্বপ্ন পূরণে আমরা কঠোর শ্রম দিতে প্রস্তুত।

পরিকাঠামোর উন্নতি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে তার দিকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

নির্মাণ শিল্পে কাজ কমছে, পরিষেবা ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীরা ছুটছে আর এই বৈষম্য দূর করতে মোদীর ভাবনা— 'গত এক দশকে এই সমস্যা সমাধানে ইউপিএ সরকার কোনও পদক্ষেপই করেনি। ক্ষমতায় আসীন হলে আমরা গুরুত্ব দেব নির্মাণ শিল্পে যেখানে কাজ তৈরি হয়। এই নির্মাণ শিল্পে রয়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্প। দুনিয়ায় এবার যে যুদ্ধ শুরু হবে তা হলো 'কর্মযুদ্ধ' আর এই যুদ্ধ প্রস্তুতিপর্ব এখনই শুরু করতে হবে'।

ভারতীয়দের অনেকেই গৃহহীন। এদের হাতে বাড়ি পৌঁছে দিতে সহজ কিস্তিতে, কম সুদে ঋণের বন্দোবস্ত করেছিল বাজপেয়ী সরকার। কিন্তু সুদের হার চড়া হতে থাকায় মানুষের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে যে ফারাক তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য— 'আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে, গত ৬৫ বছরে প্রতিটি নাগরিকের মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা করতে পারিনি। এ বিষয়ে কংগ্রেসীরা কোনও গুরুত্বই দেয়নি, মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা করতে আমরা বদ্ধপরিকর। শুধু ছাদ-ই নয়, ওইসব বাড়িতে থাকবে শৌচালয়, বিদ্যুৎ আর জল।

আমরা বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখব। পরিপূর্ণভাবে শহর এবং গ্রামীণ হাউজিং প্রকল্পগুলি বিশ্লেষণ করব। আমাদের চেষ্টা থাকবে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর ওপর।

ভারতীয় কৃষি অনেক সমস্যার সম্মুখীন। লাভ কমে গেছে, জমির ওপর চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। কৃষি থেকে কৃষকরা যাতে লাভ করতে পারেন এবং তাঁদের উৎপাদিত ফসলের যথাযোগ্য মূল্য পান সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। ইউপিএ সরকার এই সেক্টরকে অবহেলা করেছে, কৃষকদের জন্য কার্যত কিছুই করেনি। কৃষকদের সমস্যাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখব কৃষি সংক্রান্ত পরীক্ষাগারের ফলাফল যাতে কৃষিক্ষেত্রে

এভাবেই প্রতিদিন শত শত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে ভারতে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে তার মাত্র গুটিকয়েক।

পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করা। এই বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি নিতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বর্তমান সরকারের সম্পূর্ণ অবহেলিত সেক্টর কৃষিকে জাতীয় ফোকাসে আনতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে কৃষকের হাতে অর্থের জোগান দেওয়া'।

এযুগে সবচেয়ে বড় লড়াই হলো উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের। এই দুই বিপরীতধর্মী ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানে তাঁর বক্তব্য— 'উন্নয়ন আর পরিবেশ দুটি বিষয়ই আমাদের কাছে অপরিহার্য। কোনও প্রকল্পের অনুমোদন দেবার প্রক্কালে খতিয়ে দেখতে হবে পরিবেশের বিষয়টাকে। পরিবেশ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, তাতে প্রকল্পগুলি রূপায়ণে বিলম্ব হচ্ছে। সমস্ত প্রকল্প তা সে বাতিল হোক বা না হোক--- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে'।

অনুপ্রবেশ

কেবলমাত্র ধর্মের কারণে বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে নির্যাতন ও সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। দেশ ভাগের সময় বাংলাদেশে জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ ছিল হিন্দু। এখন সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। এই হিন্দুদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তারা ভারতে ফিরে আসতে চায়, কেননা আমাদের কাছে তারা আশ্বস্ত বোধ করে। শুধুমাত্র আমাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে এইসব মানুষদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত? শরণার্থী যাঁরা, তাঁরা আমাদের আপনজন। তাঁদের দেখভাল আমাদের কাজ। শুধু বাংলা বা অসম নয়, পাঞ্জাব, গুজরাট আমরা সকলে মিলে সামলাব তাঁদের। কিন্তু যাঁরা অনুপ্রবেশকারী, জেনে-বুঝে ভারতে আসছে তাদের ফিরে যেতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, অনুপ্রবেশ ভারতের উপর আক্রমণ, সেটা ঠেকাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুপ্রবেশকারীরা একটা রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে ভারতে ঢুকছে। এর আগে ভারতের কোনো দলই অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে কখনও কিছু বলেনি। কোনে কোনো দল প্রকাশ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। কোনো কোনো দল নীরব থেকেছে। এই প্রথম দেখা যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের প্রকাশ্যেই ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বিজেপি-র ইস্তাহারেও বলা হয়েছে, ভারত হিন্দুদের স্বাভাবিক বাসভূমি। বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, মুসলমান বা খৃস্টান— সকলেই যারা ভারতে জন্মেছে ও বড় হয়েছে, তারা সকলেই আমাদের লোক। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে হিন্দুধর্ম (হিন্দুইজম) কোনো উপাসনা পদ্ধতি (রিলিজিয়ন) নয়, কিন্তু একটি জীবন-পদ্ধতি। আমরা সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারেই কাজ করে থাকি।

সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীমণিকুন্তলা দেবীর ১১৫তম শুভ জন্মোৎসব

আগামী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ (২রা জুন, ২০১৪) সোমবার সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুর মহোদয়ের সহধর্মিণী সঙ্ঘ-মাতা শ্রীশ্রীমণিকুন্তলা দেবীর ১১৫তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হবে।
আপনি সবান্ধব উৎসবে যোগদান করে উৎসবের আনন্দবর্ধন করবেন।

ইতি
মাতৃসেবক

ব্রহ্মচারী ঋতেন ভাই
সঙ্ঘ-সভাপতি
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ

ব্রহ্মচারী মুরালভাই
সঙ্ঘ-সম্পাদক
শ্রী গৌরদেব মুখার্জী
যুগ্ম-সম্পাদক

চিঠিপত্র

‘ঠাকুর ঘরে কেরে, আমি তো কলা খাইনি’

বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্ধত আচরণ অসভ্য লোকের মতো দিন দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে একটাই প্রবাদ মনে পড়ছে ‘ঠাকুর ঘরে কেরে, আমি তো কলা খাইনি’-র মতো। সারদার কথা বললেই তিনি অগ্নিশর্মা, সারদা সংক্রান্ত তদন্ত ই ডি দিয়ে করাতেই তাঁর মনে হচ্ছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হবেই, তাই শাসকশ্রেণীর সকলের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কেঁচোর বদলে সাপ যে বের হবেই এ সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষ যারা সারদায় টাকা রেখে সর্বস্বান্ত হয়ে কয়েকজন আত্মঘাতী হয়েছে তাদেরও আত্মা শান্তি পাবে এই জেনে যে সারদার সুদীপ্ত কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকলের সর্বনাশ করেছে। আজ জনগণের সহায় এই ইডি তদন্তে প্রকাশিত হবে কারা তাদের সর্বনাশের জন্য দায়ী। আমি যদি সৎ হই তাহলে সি. আই ডি. সিবিআই বা ইডি যে কোনো ধরনের তদন্তে রাজি হব নাই বা কেন আর তাতে এত রাগই-বা কিসের। তাঁর অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখলে মনে হয় না একবারও যে তিনি কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কই এর আগে তো প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, বিধান রায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ সকলেই মনে হয় ভদ্রসন্তান, কারণ যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো ঘাত প্রতিঘাতে যেকোনো বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েও এইরূপ মুখভঙ্গি করেননি এবং প্রকারান্তরে অর্থমন্ত্রী ও অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে অশালীন মন্তব্যও করেননি।

কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কোনো অশালীন মন্তব্য করেননি, সম্বোধনেও শালীনতা বজায় রেখে গেছেন। তাহলে রাজ্যের নেত্রীর একি কদর্য সম্বোধন! কই চিটফান্ড কাণ্ডে গান্ধী পরিবারের সোনিয়া গান্ধী তো বলেছেন, ‘চিটফান্ডের লুটে মদত রাজ্যের। কই তাতে তো নেত্রীর মাথাগরম হয়ে ওঠেনি। তাহলে কি ভাবতে হবে নেত্রী অলীক কল্পনার মতো ভাবছেন এবার কংগ্রেস আসবে আর তিনি গাঁটছড়া বাঁধবেন। আর ভয় দেখিয়ে ৩/৪টি মন্ত্রিত্ব বাগিয়ে নেবেন। সারদার প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাঁর দলের লোক। এঞ্জেলো, পিকাসো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, দেশের গণেশ পাইনের থেকেও বেশি বড় আকাশ ছোঁয়া চিত্রশিল্পী মনে করেন। তাই তাঁর ছবি কোটি কোটি টাকায় কেনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু কাদের নাম বলেছিলেন তাদের ঘর অফিস তল্লাসি করে কোনো ছবি পায়নি এটা কি ধরনের সততার পরিচয় কে জানে? তাহলে ছবিগুলো কি হলো? কোটি কোটি টাকার হিসাব কোথায় গেল? নেত্রী একজায়গায় বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে জাতি ধর্ম নিয়ে কোনো রাজনীতি হয় না। এটা সর্বৈব মিথ্যাকথা, তিনি ইমামদের জন্য ভাতা মোয়াজ্জিমদের জন্য ভাতা, ৫০ হাজার সাইকেল মাদ্রাসার ছাত্রীদের দান, হজযাত্রীদের বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি এবং শুধু তাই মুসলমান নারীর ন্যায় মাথায় কাপড় দিয়ে কানের পাশ দিয়ে রোজার পর দোয়া মাঙা ইফতারে যোগ দেওয়া কি ভোটের স্বার্থে সংখ্যালঘু তোষণ ও জাতিধর্ম নিয়ে রাজনীতি নয়? শাক দিয়ে আর কত মাছ ঢাকবেন? চিট ফান্ডের মালিকের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে লগ্নীকারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বললে ‘ঠাকুর ঘরে কেরে, আমি তো কলা খাইনি’র মতো রাজ্যের নেত্রী এত অসভ্য আচরণ করছেন কেন?

—**দেবু সরকার,**
মেমারি, বর্ধমান।

বিজেপি-তে অনুপ্রবেশ

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কংগ্রেসী সাংবাদিক এম জে আকবর বিজেপি-তে যোগদানের সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এই এম জে আকবর এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জনসাধারণের গোচরে আনার প্রয়োজনে এই পত্রের অবতারণা।

এম জে আকবরের পিতামহের নাম প্রয়াগ, ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে বিহারের এক ভোজপুরী গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সত্তরের দশকের মন্বন্তরে কেউ বাঁচেননি ওই গ্রামে। দৈববসে ১১ বছরের শিশু প্রয়াগ বেঁচে রইল। শিশু প্রয়াগ ট্রেনে বসে চন্দননগর চলে এল। চন্দননগরের তেলিনীপাড়া পল্লীতে পৌঁছল, কাছেই ভিক্টোরিয়া পাট কারখানা ওই গরিব বস্তিতে এক চা-এর দোকানের মালিক ওয়ালি মহম্মদ নামে এক বিহারী নিঃসন্তান দম্পতি তাকে আশ্রয় দিলেন। সে চা-এর দোকানের কাজকর্ম শিখলো। ওয়ালির মৃত্যুর পর চা-এর দোকানের মালিকানা প্রয়াগের উপর বর্তালো, ওয়ালির স্ত্রী তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তার নাম রাখা হলো রহমতউল্লা। তার পুত্র হলে নাম রাখা হলো আকবর আলী, আকবর চন্দননগর কলেজে শিক্ষা লাভ করে পরে পাটকলের স্কট সাহেবদের সঙ্গে তার দোস্তি হলো, এর মধ্যে এক পুলিশকর্তার দৌত্যে অমৃতসরবাসিনী এক কাশ্মীরি কন্যার সঙ্গে আকবর আলীর বিবাহ হলো। আকবর কলকাতা বয়েজ, প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষা লাভ করে সাংবাদিকতায় প্রবেশ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মল্লিকা নামে এক হিন্দু কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গোধরা কাণ্ডের পর তিনি নরেন্দ্র মোদীকে জল্লাদ বলতে দ্বিধা করেননি, কিন্তু করসেবকদের পুড়িয়ে মারার জন্য কোনো নিন্দা বা দুঃখ প্রকাশ করেননি, হঠাৎ রাতারাতি সাম্প্রদায়িক নরেন্দ্র মোদীর সমর্থক হয়ে গেলেন। এটা আমার দেখে খুব একটা ভাল ঠেকছে না, তিনি রাজীব গান্ধীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কংগ্রেসের টিকিটে মুসলিম প্রধান কিষাণগঞ্জে নির্বাচনেও লড়েছিলেন, এখন অনেক নেতাই বিজেপিতে ঢুকবেন, তবে বিজেপিকে অতি সাবধানে পা ফেলতে হবে। না হয় এর জন্য চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,** কলকাতা-৬৪।

বিশ্বশান্তির জন্য প্রয়োজন হিন্দুত্ব

সমীর কুমার দাস

'হিন্দু' শব্দটি কোথাও থাকলেই তা বর্জনীয় এবং সেকুলার ও প্রগতিশীল কর্ম বলে চিহ্নিত করে থাকে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলো। এই বিভ্রান্তিকর আচরণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সংক্রমণ ঘটানোই অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু এই অসৎ উদ্দেশ্য যে সফল হওয়ার নয় তা ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান চালচিত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বরং হিন্দু ভাবধারা বর্তমান ভারতীয় সমাজে যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে তা বলা যেতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটেছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভোটব্যাঙ্ককেন্দ্রিক তুষ্টীকরণ রাজনীতির অপচেষ্টা ক্রমশই বিফলে পরিণত হচ্ছে। এই স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা মুখে সেকুলারইজমের নামে সামাজিক সদ্‌ভাবকে বিঘ্নিত করে থাকেন। আবার একশ্রেণীর মিডিয়া এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে হিন্দু আদর্শবাদের বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। এরাই আবার 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র আলখাল্লা পরে সমাজে বিভ্রান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে হিন্দু সন্ত্রাস, গৈরিক সন্ত্রাস বলে অপপ্রচার করে থাকেন। এই রাষ্ট্রবিনাশী ষড়যন্ত্রে মানুষকে বিপথচালিত করে সমাজে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার প্রয়াস কখনই সফল হয়নি। অথচ 'গৈরিক' ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয় চিহ্ন। এর সঙ্গে 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দ যোগ করা অত্যন্ত নিন্দনীয়, দেশদ্রোহিতার সঙ্গে তুলনীয়। আর হিন্দু ও হিন্দুত্বকে অপমান করার অর্থ রাষ্ট্রের অবমাননা করা। অথচ 'জিহাদি আতঙ্কবাদ', যার সঙ্গে মুসলমানরা জড়িত তা শুধু ভারতবর্ষ নয়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান তো বটেই ইংল্যান্ড, আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই সন্ত্রাসবাদের প্রভাবে আমাদের দেশই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ এই দেশের মূল সমাজ হিন্দুসমাজ যা দেশের মুখ্য রাষ্ট্রপ্রবাহ। তাই সন্ত্রাসবাদীর উদ্দেশ্য থাকে এই সমাজের মনোবল ভেঙে দেওয়া। অর্থাৎ দেশের মনোবল ভাঙা এবং দেশকে অপদস্থ করা। হিন্দুত্ববিরোধীদের এই ক্রিয়াকলাপের জন্যই প্রমাণিত হয় যে সন্ত্রাসের সঙ্গে হিন্দুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম শান্তি স্থাপনের মূর্ত প্রতীক। এই সনাতন ধর্মের অবনতি হলে জাতির অবনতি হবে। এই সনাতন ধর্মই হলো জাতীয়তা। আর হিন্দুত্বই ভারতীয়ত্ব।

হিন্দুধর্ম উদার, সহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করে। তাই হিন্দু ও হিন্দুত্বের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা শুধু এদেশে নয় বহির্ভারতেও এর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বাড়ছে। আমেরিকা, কানাডার মতো তথাকথিত উন্নত ও প্রগতিশীল দেশে হিন্দু পরিচয়ের জন্য মানুষ গর্ববোধ করে। এই দেশগুলোতে মানুষ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন উৎসবে আগ্রহসহকারে যোগ দেন। এখানে কট্টরতা বা মৌলবাদ প্রশ্রয় পায় না। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রভাব যথেষ্ট। এছাড়াও ভারতের যোগ দর্শন মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে আচার্য রবিশঙ্কর, মহর্ষি মহেশযোগী, স্বামী চিন্ময়ানন্দ এবং বাবা রামদেবজীর ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বহির্ভারতে এদেশীয় যোগ, ধ্যান, প্রাণায়ামের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের গুরুত্ব বেশি বাড়ছে। এ সকল ঘটনা পরম্পরা জানার পর হিন্দু ও হিন্দুত্বকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়া মুর্খামির পরিচয়। বরং হিন্দুত্ব বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করে। আর হিন্দু দর্শনকে বিপথগামী করবার অপচেষ্টা কখনই ফলপ্রসূ হয়নি। হিন্দু দর্শন, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বের মানুষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ থেকে হিন্দুত্ব বিরোধীদের শিক্ষা নেওয়া দরকার।

এছাড়াও মানুষের একতা ও ঐক্যের মেলবন্ধন হিসেবে বিভিন্ন কুম্ভমেলা, সাগরমেলা সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে সারা বিশ্বে মান্যতা লাভ করেছে। একথা স্বীকৃত ও নির্বিবাদ সত্য। হিন্দুধর্মের এই ঐতিহ্য কখনই সন্ত্রাসের দ্যোতক হতে পারে না। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম হলো বিশ্বজনীন ধর্ম। হিন্দুত্বের চিন্তাধারা ও অস্মিতার কারণে বিশ্বে অনেক অশুভ শক্তি বিনাশ হতে পারে। উদার সহিষ্ণু সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে যা একান্ত আবশ্যক। আর হিন্দুধর্মে অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতা কখনও প্রশ্রয় পায় না। যা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন।

বস্তুত হিন্দুত্ব কোনো সম্প্রদায় বা পন্থের নাম নয়। হিন্দুত্ব জীবন ধারণের এক পদ্ধতি। আর হিন্দুধর্ম হলো মানব ধর্ম। কবির কথায়, 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'। এই নানা ভাষা, নানা সম্প্রদায়, নানা বৈচিত্র্যকে নিয়েই হিন্দুত্ব। এর মূলে রয়েছে হিন্দু দর্শন। সারা বিশ্বের সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য হিন্দুত্বের আবশ্যকতা অবশ্যম্ভাবী। এখন তা বেশি করে প্রতীয়মান হচ্ছে। হিংস্রতাকে দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বকল্যাণকারী হিন্দুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। স্বামীজী বলেছিলেন, 'গর্বের সঙ্গে বলো আমি হিন্দু'। তিনি আমেরিকার শিকাগোতে হিন্দুত্বের গর্জন করেছিলেন। ফলে সমাজে নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই স্বার্থ ভেদাভেদের কলুষতাকে পরিত্যাগ করে পরম বৈভবসম্পন্ন সমাজ নির্মাণের জন্য সর্বতো প্রয়াস করা দরকার। সারা বিশ্বকে সমস্যা থেকে মুক্ত করে হিন্দুত্বই পারে সুখশান্তির পথকে সুগম করতে। এটাই যে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের একমাত্র পথ তা ভাববার সময় এসেছে।

পরম্পরা

কৌলাচার

নবকুমার ভট্টাচার্য

শ্রৌতসাহিত্যে বংশ অর্থে কুল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সৌভাগ্য ভাস্করে কুল শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাস্কর রায় লিখেছেন— পরমশিব থেকে স্বগুরু পর্যন্ত বংশ কুল। 'সংখ্যা বংশ্যেন' পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যে বলা হয়েছে বংশ দু'রকমের। এক বিদ্যাগত, দুই বংশগত। কৌলাচারের কুল বিদ্যাগত কুল। পরমশিব থেকে স্বগুরু পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে এই কুল বিস্তৃত। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে— গোত্রকে কুল বলা হয়। তা শিবশক্তিসমদ্ভূত। এই কুলের জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয়। কৌলাচারপরায়ণ সাধককে তন্ত্রে কৌল, কৌলিক বা কুলীন বলা হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে— যিনি শ্রীগুরুর করুণাপ্রাপ্ত হয়েছেন, দীক্ষার দ্বারা যাঁর পাপ ধৌত হয়েছে এমনি সাধকই কৌল। তন্ত্রে কুলকে শক্তি বলা হয়েছে। শক্তিকে বলা হয়েছে কুল আর শিবকে অকুল। কুল অকুলের সম্বন্ধকে বলা হয় কৌল। অর্থাৎ কুল ও অকুলের অনুসন্ধান নিপুণ সাধকদের বলা হয় কৌলিক সাধক। অভিনবগুপ্ত কুলকে বলেছেন পূর্ণসদ্বিৎলক্ষণ। পূর্ণসদ্বিৎলক্ষণ ব্রহ্ম। কাজেই কুল ব্রহ্ম— 'ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্'। যাঁরা কুলাকুলতত্ত্বজ্ঞ এবং কুলপূজক তাঁরাই কৌল। কুল বলতে আবার মূলাধার চক্র এবং সুষুন্না নাড়ীকেও বোঝায়। সৌন্দর্য লহরীর টীকায় বলা হয়েছে— কু অর্থাৎ পৃথিবীতত্ত্ব যাতে লীন হয় তা কুল অর্থাৎ আধারচক্র। লক্ষণার দ্বারা সুষুন্নামার্গকেও কুল বলা হয়। মূলাধারচক্রে দেবীর আরাধনা করাই কৌলত্ব। রুদ্রযামলের মতে যে আচারে কুলগুরু কুলদেবীর নিত্যপূজা হয় তাই কুলাচার। এ সম্পর্কে কৌলমার্গ রহস্য গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে— ''কৌলমার্গ শব্দের পর্যবসিত অর্থ অদ্বৈত জ্ঞানেচ্ছু মুমুক্ষু সাধক যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত আচারের অনুষ্ঠান করতঃ সর্বজগৎ শিবশক্তিময় ধারণা করিয়া, শিবশক্তি সামরস্য সম্পাদনে বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, সেই পন্থার নাম কৌলমার্গ।

রুদ্রযামল তন্ত্রে কৌলাচার উদ্ভবের কাহিনীটি রয়েছে। সেখানে রয়েছে, ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ মহাবিদ্যার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পিতার কাছে মন্ত্র নিয়ে শত সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার সঙ্গে যোগাদি সাধন করলেন। কিন্তু তবু দেবীর সাক্ষাৎলাভ করতে পারলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পিতার নিকট গিয়ে বললেন, আমাকে অন্য মন্ত্র দিন, এই বিদ্যা সিদ্ধিদায়িনী নয়। ব্রহ্মা বললেন— বাপু, একান্তমনা হয়ে ভাবের সঙ্গে যোগমার্গে আবার দেবীর আরাধনা কর। তিনি অবশ্যই তোমাকে দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করবেন। পিতার আদেশ পেয়ে বশিষ্ঠ আবার সহস্র বৎসর ধরে মন্ত্র জপ করলেন। কিন্তু তবু দেবীর দর্শন পেলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দেবীকেই শাপ দিতে উদ্যত হলেন। দেবী বশিষ্ঠকে দর্শন দিয়ে বললেন— অকারণে কেন আমাকে শাপ দিতে যাচ্ছিলে? যে আমার সেবা জানে না, আমার কুলগমচিন্তার সঙ্গে যার পরিচয় নেই, সে কি করে যোগাভ্যাসের দ্বারা আমার পাদপদ্ম দর্শন করবে? আমার পবিত্র সাধনা বেদেরও অগোচর। অথর্ববেদপরায়ণ বৌদ্ধদেশ মহাচীনে যাও। সেখানে গিয়ে আমার মহাভাব প্রত্যক্ষ করে ও পাদপদ্ম দর্শন করে আমার কুল জ্ঞান লাভ করবে এবং মহাসিদ্ধ হবে। এই বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন আর বশিষ্ঠ গেলেন চীনদেশে। সেখানে বুদ্ধরূপী মহাদেবের সাধনাচার দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন। বুদ্ধ ভগবানকে বারবার মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে বললেন— আমি সিদ্ধিমার্গ জানি না, মহাদেবীর সাধনার জন্য এখানে এসেছি। কিন্তু আচার দেখে আমার

মনে মহাভয় জন্মেছে। আমার বেদগামিনী বুদ্ধি। আর এখানে সর্বকর্মে বেদবহিষ্কৃত। চীনদেশে পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা দেখে বৈদিক আচারনিষ্ঠ বশিষ্ঠ ভয় পেয়ে যান। এসব তাঁর সংস্কার বিরুদ্ধ অথচ এই দেশে সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ হবে একথা স্বয়ং দেবী বলেছেন। বশিষ্ঠ বড়ই বিপদে পড়লেন। কৃতাঞ্জলি হয়ে বুদ্ধদেবকে বললেন, প্রভু আপনার এই কুলের বিষয় আমাকে বলুন। আমি বুঝতেই পারছি না এই আচারে কি করে মনের প্রবৃত্তি হবে আর কি করেই বা বৈদিক কর্ম ছাড়া সিদ্ধিলাভ হবে। এরপর বুদ্ধদেব বশিষ্ঠকে কৌলাচার সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বুদ্ধোপদিষ্ট কৌলাচারকে মহাচীনাচার বলা হয়।

রুদ্রযামল তন্ত্রের বশিষ্ঠ কাহিনী থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে--- এক কৌলাচার বেদবহির্ভূত। দুই, এই মার্গের অনুসরণকারীদের মতে এটি বেদমার্গের চেয়ে উত্তম। দেবীভাগবতে কৌলাচারকে দুরাচার বলা হলেও কুলার্ণবতন্ত্রে স্বয়ং শিব দেবীকে বলেছেন, 'বেদশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুলপূজাং করোতি যঃ। তৎসমীপস্থিতং মাং ত্বাং বিদ্ধি নান্যত্র ভাবিনি।' অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রোক্তমার্গে যে কুলপূজা করে, তোমাকে এবং আমাকে তার সমীপস্থ বলে জানবে, অন্যত্র নহে। কৌলমার্গ রহস্য গ্রন্থে বলা হয়েছে--- কৌলাচার বেদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয়। কৌলমার্গের সাধনা সাত্ত্বিক সাধনা। বেদাচারপরায়ণ সাধক সত্ত্বগুণপ্রধান, এইজন্য তাঁহার পক্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কৌলিক সাধনারই প্রয়োজন।

তন্ত্রে কৌলাচারের আরাধ্যা দেবী শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শী। দেবীর ত্রিপুরাসুন্দরী, ললিতা, কামেশ্বরী প্রভৃতি অন্য নামও প্রচলিত রয়েছে। তবে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি

পরাশক্তির অন্যান্য দেবীও কৌলাচারে আরাধ্যা। নিরুক্ত তন্ত্রে রয়েছে— 'কুলাচারং বিনা দেবি কালীমন্ত্রং ন সিদ্ধতি।' এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বঙ্গদেশে শ্রীবিদ্যার উপাসক প্রায় নেই। কালী, তারা প্রভৃতির উপাসকরাই সংখ্যায় বেশী। বাংলার প্রখ্যাত কৌল-সাধক পূর্ণানন্দ গিরি রচিত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি শ্রীবিদ্যার উপাসনা প্রতিপাদক একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সময়াচারতন্ত্র মতে কৌলাচার দ্বিবিধ— আর্দ্র ও শুষ্ক। পঞ্চম-কারযুক্ত হলে আর্দ্র এবং পঞ্চম-কাররহিত হলে শুষ্ক বলা হয়। পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবাই কৌলাচার অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এরূপ অধিকার খুব কম লোকেরই থাকে কারণ এ পথ বড় দুর্গম। 'কৌলাবলী নির্ণয়' গ্রন্থে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, 'কৌল সাধকের বামে রমণকুশলা রমণী, দক্ষিণে মদ্যপানপাত্র, সাধকের সম্মুখে মরিচযুক্ত উষ্ণ শূকরমাংস, সাধকের স্কন্ধে ললিত রমণীয় বীণা অর্থাৎ এত লোভের মধ্যেও সাধককে অবিচলিত চিত্তে সাধনা করতে হয়। এজন্য কৌলধর্ম পরম গহন, যোগীদেরও অগম্য। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত, দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং ষড়রিপুজয়ী তিনি একমাত্র কৌলাচারের অধিকারী। কৌল সাধক হবেন নির্ভীক, সত্যবাদী। নারীর প্রতি কৌল সাধকের সসম্ভ্রম, সশ্রদ্ধ, সদয় ব্যবহার কুলশাস্ত্রে বিহিত। গন্ধর্বতন্ত্রে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— যাতে নারীদের মন দূষিত হতে পারে এমন কোনো আচরণ কৌল-সাধক তাদের সঙ্গে করবেন না। কৌল সাধনা ব্রহ্মসাধনা এবং তা গোপনীয়। নীলতন্ত্রে বলা হয়েছে কৌলাচারের সাধনা গোপনে করতে হয়। লোক দেখিয়ে এ সাধনা হয় না।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com web : www.calcuttawaterproofing.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই
ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে (পর্ব-১৩)

শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগের নূতন ধারার মন্দির

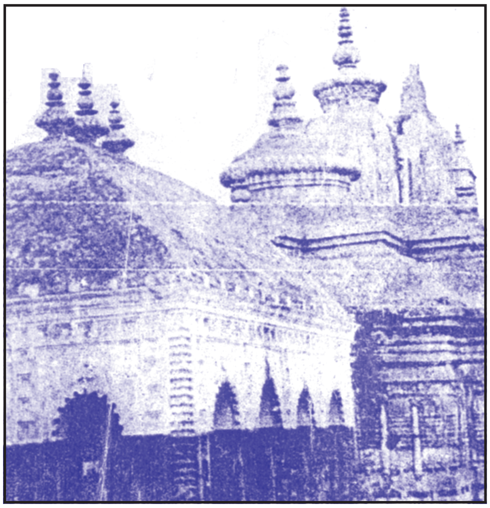

গড়বেতা

ড. প্রণব রায়

মন্দির-পুরাকীর্তির ক্ষেত্রে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত গড়বেতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাকীর্তির প্রায় সব নিদর্শনই গড়বেতা শহর ও এখানের প্রাচীন গড় এলাকার নানা স্থানে অবস্থিত।

এই স্থান গড়বেতা নামে দীর্ঘকাল পরিচিত হলেও আগে এই স্থানের আসল নাম ছিল 'বেতা'। বগড়ি রাজাদের প্রাচীন গড় এই স্থানে থাকায় পরে 'বেতা'র সঙ্গে 'গড়' যুক্ত হয়ে স্থানটির নাম হয় 'গড়বেতা'— যেমন 'গড় আড়রা' বা 'আড়রাগড়' (কেশপুর থানা), 'গড়বালুদেবপুর' (এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর)। ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে অঙ্কিত রেসেল ও অন্যান্য য়ুরোপীয়দের এই অঞ্চলের যে মানচিত্র আছে, তাতে এই স্থানকে 'বেতা' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব রেনেলের সময় পর্যন্ত যে এই স্থান 'বেতা' নামে পরিচিত ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

গড়বেতা একসময় প্রাচীন বগড়িরাজাদের রাজধানী ছিল। এই স্থানে রাজাদের এক বিরাট গড় ছিল। এর চারদিকে চারটি বিশাল তোরণের কথা জানা যায়। এই তোরণগুলির নাম ছিল— উত্তরদিকে 'লাল দরজা', পূর্বে রাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে হনুমান দরজা। প্রতি তোরণদ্বাররক্ষক দেবদেবী ছিলেন। তাঁদের নাম গোরা খাঁ পীর, ওলাইচণ্ডী, রাঘবরায় ও বারভূঞা। দুর্গ ও তোরণদ্বারের এখন আর কোনো চিহ্ন নেই। গড়ের চারপাশ পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। গড় এলাকায় বিশেষভাবে উত্তরে জলটুঙ্গী, ইন্দ্রপুষ্করিণী, পাথুরিয়াদুয়া, মঙ্গলা, কবেলদিঘি, আমপুষ্করিণী নামে অনেকগুলি প্রাচীন দিঘি বর্তমান। এগুলি ১৫৫৫-১৬১০ খৃস্টাব্দের মধ্যে উৎখনন করা হয় বলে জানা যায়।

গড়বেতার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দেবালয় সর্বমঙ্গলার দেউল। 'শিখর' দেউল হলেও এটির স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য একটু ভিন্ন মন্দির উত্তরমুখী যা প্রায় দেখাই যায় না। মন্দির গড়ের উত্তরদিকে অবস্থিত। শিলাই নদী এই মন্দিরের কিছু দূরে উত্তর-পশ্চিমে বয়ে চলেছে। মন্দির-এলাকার কিছু উত্তরে গড়ের উত্তর দিকের প্রবেশপথ ছিল অনুমান করা যায়।

মাকড়া পাথরে নির্মিত সর্বমঙ্গলার উচ্চ দেউল প্রসিদ্ধ ওড়িশী রীতির 'রেখ' দেউল হলেও মোট চারটি অংশে এই প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়িটি সম্পূর্ণ হয়েছে— ১. সূর্যমন্দির 'শিখর' দেউলরীতির। মন্দিরের সর্বমঙ্গলামূর্তি অধিষ্ঠিত গর্ভগৃহ অন্ধকারময়। সর্বমঙ্গলা মূর্তি কালো বেসল্ট পাথরের ফলকে খোদিত মহিষমর্দিনী মূর্তি। মহিষের ছিন্নদেহ থেকে মহিষাসুরের আবির্ভাব। দেবীমূর্তির দশহাতে দশটি অস্ত্র। প্রস্তরখোদিত মস্তকে গালার দ্বারা বৃহৎ মুখোশ পরানো হয়েছে।

গর্ভগৃহের সঙ্গে যুক্ত একটি 'অন্তরাল' ও 'জগমোহন'। 'জগমোহনে'র বাইরের চারপাশের দেওয়ালে 'স্টাকো'র চৌষট্টি যোগিনী মূর্তি ও সর্পকন্যা খোদিত। 'জগমোহন' মধ্যে আদামাতার প্রস্তরমূর্তি চতুর্ভুজা। বামপদের গোড়ালি যোনিমণ্ডলে ন্যস্ত ও দক্ষিণপদ দোদুল্যমান। মূর্তির বামহস্ত বৃষের ওপরে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্ত জানুর ওপর ন্যস্ত। দোদুল্যমান দক্ষিণপদ সিংহের মস্তকে ন্যস্ত। কণ্ঠে দিব্যমাল্য ও শিরোদেশ মুকুটে অলঙ্কৃত।

'জগমোহনে'র সম্মুখসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র 'যোগমণ্ডপ'। 'চারচালা' রীতির বৃহদাকৃতি নাটমন্দির এই মন্দিরসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন। এর খোলা চোদ্দটি দ্বার বর্তমান।

সর্বমঙ্গলা মন্দিরের কিছু দূরে রাধাবল্লভের 'আটচালা'-রীতির মন্দির মাকড়া পাথরে নির্মিত। মন্দিরটি মল্লরাজ দুর্জনসিংহদেব ৯৯২ মল্লাব্দ বা ১৬৮৬ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

গড়বেতায় আরো অনেক মন্দির আছে। এই স্থান চন্দ্রকোণার মতো এক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০ টাকা।

জনকল্যাণ উদ্যোগে ছোটোরা

নবাঙ্কুর

তামাক-বিরোধী দিন ও অধীপরা

কৌশিক গুহ

‘চারপাশে তামাক খাওয়া লোকের সংখ্যা বাড়ছে। তামাক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। অনেকেই একটু সময়ের আনন্দ পাওয়ার জন্যে বড়রকম বিপদকে ডেকে আনছে। তামাকের বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগানোর চেষ্টা চলেছে সারা পৃথিবীতে। আমাদের দেশেও। প্রতি বছর ৩১ মে তামাক-বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৮৭ থেকে শুরু হয়েছে সারা পৃথিবীতে। তামাকের বিরুদ্ধে প্রচার হচ্ছে একদিকে, অন্যদিকে তামাকের চাহিদাও বাড়ছে। সেজন্যে চাই ধারাবাহিক প্রচার। সমাজের সব স্তরে চেতনা জাগানো।’ অধীপদের ক্লাসে একথা বললেন পূর্ণেন্দু-স্যার। ভুগোল পড়ান। স্কুলের নানারকম কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ছাত্রদের খুব প্রিয় শিক্ষক। জীবনে কোনোদিন তামাক খাননি। তামাক খাওয়া ছাড়িয়েছেন অনেককে। স্কুলে এখন একজন শিক্ষক ছাড়া কেউ তামাক খান না। স্কুলের দারোয়ান দশরথ উপাধ্যায় খৈনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার কোনো দেশোয়ালি ভাই খৈনি তৈরি করে এগিয়ে দিলে দশরথ বলে, ‘দশ সাল হো গিয়া ছোড় দিয়া। পুরা খৈনি কা ডিব্বা ফেক দিয়া নদীমে। ঠিক কিয়া কভি নেহি খায়গা।’ দশরথের দেখাদেখি অনেকে ছেড়েছে। তামাককে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়ে একটুও অসুবিধে হয়নি তার। স্কুলের একজন শিক্ষকই তামাক খান। তবে পূর্ণেন্দু-স্যার বার বার বলায় কমিয়েছেন খাওয়া। আগে খেতেন দু-প্যাকেট। এখন খান পাঁচটা। বলেছেন, ‘চেষ্টা করবো পুরোপুরি ছাড়তে। আমার পক্ষে কঠিন কাজ।’ অধীপের পাড়ায় রবি মহান্তিদের পান তামাকের দোকান অনেক বছরের। রবির দাদু জগন্নাথ বারিপদা থেকে এসে দোকান দিয়েছিল। থাকত বিশ্বাসদের বাড়িতে। আর তাদেরই বলে অতি সামান্য ভাড়ায় জায়গা পেয়ে দোকান করেছিল। ওই দোকান থেকে সংসার চালিয়েছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছে বিয়ে দিয়েছে। জমি জায়গা কিছু করেছে। ঘরদোর পাকা হয়েছে। শুধু পান তামাক বেচে তাদের জীবন চলেছে। রবিরা এখনও মনে করে ওই দোকান তাদের অনেক দিয়েছে। এখন দোকানে তামাক-বিরোধী পোস্টার টাঙাতে হয়। আইনের কড়াকড়ি এখন। তামাক থেকে তৈরি জিনিস বিক্রি করা যায়। তবে নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়মটা বড় কড়া। রবি বলে, ‘খোলাবাজারে জিনিস বিক্রি হবে। যার খুশি কিনবে। অসুখ বিসুখ সবার হয় না। তবে মানুষের শরীর খারাপ হতে কতক্ষণ! সাবধান হওয়া ভালো।’

পূর্ণেন্দু-স্যার বললেন অধীপের উৎসাহ দেখে, ‘৩১ মে তোমরা কিছু করো। লোকজনকে বোঝানো দরকার। সাধারণ মানুষ বুঝতে চায় না সহজে। নেশার মধ্যে মজা খুঁজে পায়। আসলে নানা ভাবে বিভিন্ন কৌশলে নেশার জিনিসের প্রতি আসক্তি জাগানো হয়েছে। এখন নীতিবাক্যের ফোয়ারায় সাড়া পাওয়া খুব কঠিন। তবু চেষ্টা করতেই হবে। নয়তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরা সবাই মিলে মিছিল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারি। পোস্টার তৈরি করে ছবি এঁকে ফোটোগ্রাফ সাজিয়ে বোঝাতে অসুবিধে নেই। যাঁরা নেশাচ্ছন্ন তাঁদের নেশা থেকে বের করা কঠিন। তবে যারা অল্পবয়সী, তামাক সবে ধরেছে বা ধরেনি তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলা যেতে পারে, নেশার মধ্যে মজা আছে ঠিকই, তবে ছেড়ে দিলে নেশাহীন সুস্থ জীবনের মজা কম নয়। এইরকম নানান পদ্ধতিতে প্রচার চলতে পারে।’

পূর্ণেন্দু-স্যারের কথাগুলো মন দিয়ে শুনে তামাক-বিরোধী দিন পালনের জন্যে উঠে পড়ে লাগল অধীপরা। ওদের দলে রয়েছে কয়েকজন। সবাই মিলে আশপাশের লোকজনকে সচেতন করার পরিকল্পনা তৈরিতে মেতে গেল। বেশ সাড়া পড়ল পাড়ায়। অন্য পাড়া থেকেও কেউ কেউ এগিয়ে এলেন। তামাক-ত্যাগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন কয়েকজন।

সুশান্তকাকা বললেন, ‘মনের জোর থাকলেই তামাক বর্জন সম্ভব। আমি যেদিন তামাক খাওয়া ছাড়বো ভেবেছিলাম, সেদিন সকালে তিন প্যাকেট সিগারেট দুমড়ে মুচড়ে জঞ্জালের বাক্সে ফেলে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে আর কোনোদিনও খাইনি। তামাক ছাড়ার পর পুরনো অভ্যেস ত্যাগের জন্যে একটু অসুবিধে হোত। এখন আর কিছু হয় না। বরং সিগারেটের ধোঁয়া দেখলেই অস্বস্তি বোধ করি।’

অধীপরা এইভাবে অনেকের কথা জানাল। সকলে মিলে তামাক বিরোধী দিবস পালন করার জন্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। পূর্ণেন্দু-স্যার দেখেশুনে বললেন, ‘চমৎকার। তোমাদের ভাবনা আর কাজের মধ্যে দারুণ মিল আছে। এগিয়ে চলো নিশ্চিন্তে।’

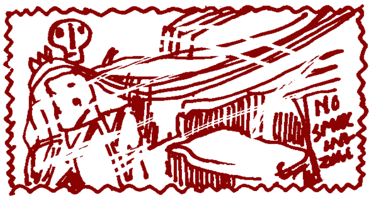

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

মৌমিতা আর ট্রেনের দাদু

দুটো নামই তার খুব পছন্দের। ভালো নাম, যেটা স্কুলে রয়েছে সেটা দিয়েছে ঠাকুমা। মৌমিতা। আর ডাক নাম কাজল। মা দিয়েছে। ক্লাস থ্রিতে পড়ে। স্কুলে তিনটে বন্ধু। শরণ্যা দেবলা আত্রেয়ী। পাড়ায় একটা বন্ধু আছে। পাশের বাড়িতে থাকে রিন্টু। এছাড়া তার আরও চারটে বন্ধু আছে। ঠাকুমা দাদু। মামাবাড়ির দিদা দাদাই। বাড়িতে মা মাঝে মাঝে একটু বকলেও জ্যেঠিমা জ্যেঠু খুব ভালোবাসে। বাবাও। ওর একটা ছোট ভাই আছে। জ্যেঠুর ছেলে টুকলু। এইবার সরস্বতী পুজোর দিন তার হাতেখড়ি হয়েছে। বই হাতে নিয়ে কতকি পড়ে যায় নিজের মনে। অনেক কথা বলতে পারে। মৌমিতাকে দিদি বলে খুব ছোট থেকে। আগে খুব কামড়াত। এখন আর করে না। ঠাকুমা দুজনকেই খুব ভালোবাসে। ভাই একটু বেশি আদর বাড়িতে পায় বলে একটুও রাগ হয় না মৌমিতার।

কি একটা অনুষ্ঠান ছিল পিসির বাড়িতে। ঠিক হলো মৌমিতাকে নিয়ে ওর বাবা যাবে। সকালে বেরিয়ে রাতে ফিরে আসবে। ছুটির দিন। রোজই সকালে তাড়াতাড়ি ওঠে মৌমিতা। সেদিনও উঠে বাবাকে জিগগেস করেছিল, 'কখন যাবো আমরা?' বাবা বলেছে, 'চানটান করে তাড়াতাড়ি। বেশি বেলা হলে রোদের তাপ বাড়বে। কষ্ট হবে।' মৌমিতাকে মা সাজিয়ে দিলো। সামান্য খাবার খেলো। বেড়াতে যাবার উৎসাহে খেতে ইচ্ছে করল না। মা একটা কৌটোতে কিছু খাবার দিয়ে দিল। ঠাকুমা কিসব দিল পিসিকে দেওয়ার জন্যে। বাবার ব্যাগটায় মৌমিতার বাড়তি জামা প্যান্ট ছিল। নুন চিনি মেশানো এক বোতল জল দিয়েছিল মা। মা আদর করে বলেছিল, 'দুষ্টুমি করবে না একটুও। বাবাকে বলবে পৌঁছে ফোন করতে।' ফোন কি একবার হবে! মা অনেকবার ফোনে খবর নেবে। মেয়েকে মাঝে মাঝে বকলেও তার জন্যে সবসময় ভাবে। মৌমিতাও মাকে ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

ওরা ফুলেশ্বর স্টেশনে ট্রেনে চাপল। হাওড়া যাবে। সেখান থেকে যাবে ট্যাংরা। মাঠপুকুরে পিসির বাড়ি। পিসি খুব ভালোবাসে ভাইঝিকে। বছরে কয়েকবার যায়। বেশ ভালো লাগে যাওয়া আর ফেরা। ছুটির দিনে ট্রেনে ভিড় কম থাকে বলে মজা বেশি। জানালার ধারে বসতে পারলে খুব আনন্দ হয়। সেদিনও বসতে পেলো জানালার ধারে। এক দাদু নিজে সরে গিয়ে মৌমিতাকে বসতে দিল। অল্পসময়ের মধ্যে ট্রেনের দাদুর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। অনেক কথা বলতে লাগল। বাড়ির কথা, স্কুলের কথা, ভাইয়ের কথা, পিসির বাড়ির কথা। দাদুর ভালো লাগছিল শুনতে। ট্রেনের অন্যরাও শুনছিল মৌমিতার কথামালা। তার বাবা বলল, 'ওর সকলের সঙ্গে ভাব। আর খুব কথা বলে।' ট্রেনের দাদু ব্যাগ থেকে বের করে কয়েকটা ছবি আঁকা স্টিকার দিলো মৌমিতাকে। তারপর একটা রঙচঙে ছবি-কার্ড বের করে লিখে দিল— 'ছোট্ট মেয়ে মৌমিতা/ডাক নাম তার কাজল/বাড়ির পাশে নদী/তাতে ভরা কত জল।/মন দিয়ে খেলবে খাবে/আর পড়বে বই।/ এগিয়ে যাবে মন দিয়ে/ বই-ই হবে সই।' দাদু একটা বই উপহার দিলো। রবীন্দ্রনাথের লেখা। মৌমিতা বলল, 'আমার একটা বন্ধু বাড়ল— ট্রেনের দাদু।' নামার সময় বলল, 'দাদু সাবধানে যাবে/ ভালো থাকবে।' স্টেশন থেকে বেরিয়ে তার মনে হলো, দাদু কোথায় থাকে জানা তো হলো না। ফোন নম্বর জানলেও হোত। 'ট্রেনের দাদুর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না!' একটু খারাপ লাগল মৌমিতার। দাদুর দেওয়া ছবি আর বইটা বাবাকে দিয়ে বলল, 'ভালো করে রেখে দাও।'

বইমিত্র

নানা বাজনায় মনভোলালো সদানন্দ

বেদে মাতৃত্বের অবধারণা

প্রাচী পাঠক

বেদের মধ্যে 'মা' বিষয়ে অনেক বর্ণনা আছে। শুধুমাত্র জন্ম দিলে মা হয় এমন নয়, দুর্বলকে প্রেমপূর্বক আশ্রয় দেওয়া ও তার পালন- পোষণকারীকেও মাতৃস্বরূপা মনে করা হয়। সেজন্য জন্মদাত্রী মায়ের মতোই পালনকর্তা ঈশ্বরকে বৈদিকযুগে মাতৃতুল্য জ্ঞান করে স্তব করা হোত।

বেদে উল্লিখিত 'মাতৃ' শব্দের তৎকালীন সংস্কৃতভাষায় অর্থ করা হোত 'নির্মাণকর্তা'। বৈদিক সমাজের পরিবার ব্যবস্থায় মায়ের ভূমিকা এভাবেই করা হোত। শিশুর পালন-পোষণ ও বড় করা মায়ের ভূমিকাকে পুরুষপ্রধান সমাজেও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখা হয়েছিল।

অথর্ববেদে পরিবারকে সুখে-শান্তিতে রাখার মায়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ আছে। সে যুগে মা-কে গৃহকর্ত্রী ও পুরো পরিবারের মালিক এবং শিশুর প্রথম গুরু মনে করা হোত। 'অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ' (অথর্ববেদ ৩,৩০.১)। বৈদিক ঋষি বলতেন, শিশুর ব্যবহার মায়ের মতো হবে এবং মা সর্বদা শিশুকে আনন্দে রাখবেন। 'সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ। অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাধন্যা।।' (অথর্ব বেদ ৩.৩০.২)। এতে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি অনন্ত ভালোবাসা আশা করে, যেমন গোমাতা তার বাছুরকে করে। বেদে বলা হয়েছে, জীবনের যত রকম সম্পর্ক আছে তার মধ্যে মাতা ও পুত্রের সম্পর্ক শ্রেষ্ঠ।

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সন্তান প্রতিপালন করে বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেজন্য এটা আশা করা যায় বিবাহের মাধ্যমে নারী সুন্দর ও বীরপুত্রের মাতা হবেন। এজন্য বিভিন্ন সংস্কারও পালন করা হোত। বেদে আরো বলা হয়েছে— নববধূ পৃথিবীর মতো; তিনি ইন্দ্রাণীর মতো গর্ভ ধারণ করবেন। সমস্ত দেবতারা আশীর্বাদ করবেন। যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করে পুত্র বড় হয়ে বীরপুত্র রূপে মাতাকে রক্ষণ করবে।

স্ত্রীর পুত্রবতী হওয়াকে ভাগ্যের পরমোৎকর্ষ মনে করা হয়। বেদের যুগে মাতৃত্বকে সম্মান জানানো মানুষের প্রবৃত্তি অথর্ববেদে এভাবে উল্লেখ আছে— 'হে কন্যা, তোমাকে জন্ম দেওয়া মাতৃকুল ও তোমার স্বামীকে জন্ম দেওয়া তোমার শ্বশুরকুল উভয় পরিবারকে তুমি যুক্ত কর।' বৈদিক সাহিত্যে কিছু উপমাও মাতৃত্বের গৌরবের দিক উল্লেখ করেছে— পুত্রবতী স্ত্রীর চারপাশে যেমন তার সন্তানরা থাকে তেমনি ঋত্বিজও সোমের চারপাশে জমা হয়েছে'। অথবা 'গোমাতা বাৎসল্যভাবে যেমন তার বাছুরকে স্নেহ করে, সে রকমই আমাদের স্তোত্রগুলি

অঙ্গনা

ইন্দ্রকে স্পর্শ করে'। বেদের মধ্যে সৃষ্টির রহস্য বিষয়ে ভালো ভালো যে শ্লোকগুলি আছে তার মাধ্যমে বৈদিককালের মানুষের দেবতা ও প্রকৃতির বিষয়ে মমত্বপূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়।

ঋগ্বেদে দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে দেবীদেরও প্রার্থনা করা হয়েছে। দেবীর সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও জনমানসে তাঁদের স্থান অনেক উপরে ছিল। এঁদেরকে মাতৃরূপে পূজা করা হয়। দেবীদের মধ্যে অদিতির নাম মুখ্য রূপে নেওয়া হয়। কারণ তিনি দেবমাতা। তিনি বিশ্বের সমস্ত রাজা ও সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী পুত্রদের মাতা। শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্ব সংসারের নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী। তাঁর পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও স্তব করা হয় কল্যাণ কামনায় ও দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে। অদিতি শব্দের ব্যাখ্যা 'ন দীয়তে খণ্ড্যতে বধ্যতে বৃহত্বাৎ' রূপে করা হয়েছে। সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্তি ও তাঁর আরাধককেও বন্ধন থেকে মুক্তিদাত্রী মা রূপে অদিতির স্তব করা হয়েছে।

ভুমিসূক্তে পৃথিবীমাতার স্তব করা হয়েছে— 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহম্ পৃথিব্যাঃ। (অথর্ব ১২.১.১২) অর্থাৎ পৃথিবী আমার মা, আমি তাঁর পুত্র। আহুতি প্রদান করে ঋষি এই মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। পৃথিবী মানুষ ও সমস্ত জীবকে পালন ও পোষণ করে। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। সর্বদাত্রী ধরিত্রীমাতার সবকিছু নষ্ট না করে সংযত ও কৃতজ্ঞভাব স্বীকার করার মানসিকতা বৈদিক সাহিত্যে বিশ্বের নিকট উদাহরণ হিসাবে আছে।

এছাড়া, মানুষকে স্থিরতাপূর্ণ জীবনযাত্রা দেওয়ার জন্য নদীকে 'মা' রূপে বন্দনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের এক সূক্তে সরস্বতী নদীকে 'অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋষি বিশ্বামিত্র শতদ্রু ও বিপাশা নদীর স্তুতি করার সময় 'মা' রূপে ভক্তি নিবেদন করেছেন। তাতে মা শিশুকে স্তন্যপান করানোর মতো নদীও দেশবাসীকে তার জলধারার দ্বারা পুষ্ট করার বর্ণনা আছে।

বেদের মধ্যে সাত-আট দেবীর সাক্ষাৎ মাতৃরূপে উল্লেখ আছে। অষ্টমাতৃকার বর্ণনায়—

'ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডী বরাহী বৈষ্ণবী তথা।
কৌমারী চৈব চামুণ্ডা চর্চিকেত্যষ্টমাতরঃ।।'

এই অষ্টমাতৃকার মন্দির আজও ভারতের বিভিন্নস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও বেদে ঊষা, বাক্, ইড়া, পৃশ্নী, বৃহদ্দিবা, একাষ্টকা প্রভৃতি দেবীকে মাতারূপে বন্দনা করা হয়েছে। অগ্নিদেবের বর্ণনা মাতারূপে কোনো কোনো সূক্তে বর্ণনা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বেদমাতারূপে গায়ত্রী অর্থাৎ ছন্দকে স্তুতি করার উল্লেখ আছে। বেদের পর পুরাকালে ও বর্তমানকালে মাতারূপে উপাসনা করা হয় লক্ষ্মী, পার্বতী, সরস্বতী- সহ অনেক দেবীকে। অর্ধনারীশ্বরের মতো দেবতার উপাসনা প্রমাণ করে দেবতাও মাতৃরূপী নারী ছাড়া পূর্ণ হয় না। প্রকৃতির মূর্ত অমূর্ত সমস্ত রূপকেই বৈদিক ঋষি থেকে শুরু করে আমরা মাতৃরূপে পূজা করে থাকি। জীবনকে সুষ্ঠুভাবে বিকাশকারী সমস্ত কিছুকেই বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মাতৃরূপে পূজা করা চলছে। বেদ স্বয়ংই মাতৃস্বরূপা।

(সৌজন্যে হিন্দী বিবেক)

অতিথি কলম

কাঞ্চন গুপ্ত

নরেন্দ্র মোদী-ই এবারের ভারত কান্ডারি

কাঞ্চন গুপ্ত

দেশের অর্থনীতির ভয়াবহ অবস্থা, মানুষের মনে এমনই আশঙ্কা যে এই ভয়াবহ আর্থিক দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার— নইলে তার পরিণতি আগামী ছয় মাসে নব্বই দশকের গোড়ায় যে সঙ্কট ছিল তা থেকে অনেক গুণ বেশি দেশ সঙ্কটাপন্ন হবে। স্বাভাবিক ভাবে সাম্প্রতিককালে এই সঙ্কট থেকে রক্ষা পেতে মানুষ আশা রাখছে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর ওপর। গত সপ্তাহে একগুচ্ছ টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদী তাঁর দলের অর্থনৈতিক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার অ্যাজেন্ডা জনসমক্ষে রেখে বলেছেন যে, তাঁর দল ক্ষমতাসীন হলে দেশের অর্থনীতি সঠিক পথেই পরিচালিত হবে। বাস্তবিক অর্থে মোদী প্রবাহে আসীন হয়ে দেশে আশার সঞ্চার হয়েছে যে, গত এক দশকে কংগ্রেসী অপশাসনে দেশের অর্থনীতি আজ খাদের কিনারে এবং মোদীর ওপরেই দেশবাসী সেই আস্থা রাখছে। যখন মোদী দেশের নির্মাণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথা বলেন, দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেন পরিকাঠামোয় বৃহৎ লগ্নির কথা বলেন। যখন বলেন এইসব ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে স্বদেশী বিদেশী পুঁজি নিবেশের কথা। মানুষ আশ্বস্ত হচ্ছে এই আশায় বুক বেঁধে যে, কংগ্রেসী জমানায় খাদ্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধি যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে সেখানে নরেন্দ্র মোদী আশ্বাস দিয়েছেন যে, আম আদমির খাবার টেবিলে খাবার সস্তা হবে। এইভাবে তিনি দেশের প্রবীণ ও নবীন ভোটারদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। নবীনদের হাতে কাজ থাকবে, প্রবীণদের জন্য সস্তায় খাদ্যসামগ্রী।

নিঃসন্দেহে বলা যায় ভাবী প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের সামনে কঠিনতর চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জের লক্ষ্য হলো বেহাল আর্থিক দশাকে ফের সঠিক স্থানে সংস্থাপন করা। আগামী ১৬ মে-র মধ্যে অসম্ভব কিছু না ঘটলে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। ক্ষমতাসীন হয়েই তৎপরতার সঙ্গে আস্তিন গুটিয়েই কোমায় চলে যাওয়া আর্থিক দশাকে শুশ্রূষা করে তাঁকে জীবনদান করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। তিনি কীভাবে সেই ম্যাজিক দেখাতে পারেন আগামী কয়েক মাসে সেটাই দেখার বিষয়। কিন্তু গুজরাটে তাঁর শাসনের যে ট্র্যাক রেকর্ড তাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি ২০১৪ সালের মধ্যে কিছু ভাল পরিণাম আমরা পাব। সরকারি সংস্থাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃস্থাপন এবং পরিকল্পনা গ্রহণে স্বচ্ছতার পুনর্বহাল— যে ব্যাপারে মোদীজী বারবার বলছেন সুদিন আসছে। দুর্মুখরা তাঁর ব্যর্থতাই চাইবে, কিন্তু তারা আশাহত হবে।

অর্থনীতির পর যে বিষয়ে মোদী গুরুত্ব দেবেন তা হলো কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক। গত দশকে ইউপিএ সরকারের সঙ্গে বিরোধী-শাসিত বিশেষত বিজেপি ও তার জোটসঙ্গী পরিচালিত রাজ্য সরকারের সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তাতে রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক এক অবিশ্বাসের স্তরে নেমে এসেছে। এক অনুৎসাহী, পঙ্গু প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে যে ফাটল ধরিয়েছেন তাতে প্রলেপ দেওয়ার কোনও চেষ্টাই হয়নি। মনমোহন নিজেকে জাতীয় নেতা

> **প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে 'টিম ইন্ডিয়া' গড়ার ভাবনা শুনতে শ্রুতিমধুর হলেও তা অলীক কল্পনা নয়। মোদীর এর দ্বারা কেবল নাম কা ওয়াস্তে একটা মঞ্চ গড়ার কথা বলেননি বরং সমন্বয়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অঙ্গীকারের কথা বলেছেন। স্মরণে রাখতে হবে এর দ্বারা সামগ্রিক ভাবে সারা দেশের সঙ্গে প্রতিটি রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।**

হিসেবে তুলে ধরতে পারতেন, কিন্তু তা না করে উল্টে তিনি ১০ জনপথের দ্বাররক্ষী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তাঁর সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব সোনিয়ার হাতে সঁপে দিলেন। যদি সত্যি বলতে হয় তবে বলতে হবে যে, তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর ইনিংস শুরু করেছিলেন ইজ্জত ও আত্ম-মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে। তিনি মৃদু সুরে বলতেন গণ্ডির বাইরে থাকার কথা, কিন্তু আদতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রভুকে তোষামোদের বাইরে কিছু ভাবতে পারতেন না। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকে সম্মেলন করা হোত এবং ওইসব সম্মেলন থেকে কোনও ফলাফল বেরিয়ে আসত না। মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে কোনও কাজের কাজ না হওয়ার জন্য পরবর্তীকালে তাঁরা মনমোহনের আহ্বান গ্রাহ্য করতেন না। গত দশ বছরে মনমোহন একাত্মতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দারুণ ভাবে ব্যর্থ যা ইয়েটসের একটা কবিতা স্মরণে আসে— "Things fall apart, the Centre cannot hold"। অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তার আম আদমি পার্টির অভ্যুদয় অবশ্যই দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এক মোক্ষম উপাদান। কেন্দ্রকে শক্ত হাতে হাল ধরতে গেলে তৎপরতার সঙ্গে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিশ্বাসের আবহ তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে। মোদী এই দিশায় পদক্ষেপ উঠিয়ে এই বিষয়ে সংস্কার আনতে চান, কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কে যে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে তাতে যে প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন— সেই তথ্য উঠে এসেছে মোদীর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। তিনি এই ধারণায় জল ঢেলে দিয়েছেন যে, সুসংহত দেশ গড়তে বিভেদ, ভিন্নতা থাকলে চলবে না। তিনি এই মিথ ভেঙে দিতে চান যে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকার-ই অপরিহার্য। তিনি জোর দিতে চান আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদার সঙ্গে বিবেচনা করার উপর। গুজরাটে দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকার সুবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ের অর্থ কি সেটা মোদী বিলক্ষণ জানেন যা আসলে সোভিয়েত মডেলের অনুকরণে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতারই প্রতীক। মোদী সাম্প্রতিক কালের ভাষণে যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে যে খামতি রয়েছে, চিড় ধরেছে তার খোলনলচে বদলে দেবেন। এমন ইঙ্গিত বিজেপি-র দলীয় ইস্তাহারেও রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে 'টিম ইন্ডিয়া' গড়ার ভাবনা শুনতে শ্রুতিমধুর হলেও তা অলীক কল্পনা নয়। মোদী এর দ্বারা কেবল নাম কা ওয়াস্তে একটা মঞ্চ গড়ার কথা বলেননি বরং সমন্বয়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অঙ্গীকারের কথা বলেছেন। স্মরণে রাখতে হবে এর দ্বারা সামগ্রিক ভাবে সারা দেশের সঙ্গে প্রতিটি রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। জাতীয় অভীষ্ট নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু কোনও অভীষ্ট-ই সিদ্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে। মোদী আস্থা রাখেন মুখ্যমন্ত্রীদের কাজে, প্রতিটি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে চান, কেননা তাঁরাই জানেন তাঁদের রাজ্যগুলিতে কোন কোন বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া উচিত বা অনুচিত এবং কেন্দ্রীয় অনুদান কীভাবে খরচ করতে হবে সে বিষয়ে তাঁদের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, শুধু তাই নয়, বিদেশনীতি প্রণয়নে তাঁদেরও সামিল করতে হবে কারণ বিদেশনীতির অভিঘাত প্রতিটি রাজ্যে অনুভূত হয়। অনেকেই হয়তো কটাক্ষ করবে যেসব ক্ষেত্র নিয়ে এতদিন কেউ চিন্তা-ভাবনা করেনি, কীভাবে সেই পথে তিনি চলবেন? কিন্তু সময় এসেছে নতুন করে এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার, কেননা এই ভাবনায় নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'Idea of India'। এই ভাবনা কেবল সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বহুত্ববাদের ক্ষেত্রে সীমিত করলে চলবে না বরং এর সঙ্গে সংযোজন করতে হবে রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে এবং একইসঙ্গে আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

অন্য অর্থে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের উন্নতি এক কথায় মোদীর লিটমাস টেস্ট। যদি তিনি কেন্দ্রের কুক্ষিগত ক্ষমতাকে ভেঙে তা ইতিহাসে পরিণত করতে পারেন এবং নতুন করে আক্ষরিক অর্থে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেন তবে তা হবে সোভিয়েত যুগের কুক্ষিগত ক্ষমতা অপসারণের এক নয়া উপায়। নয়া দিল্লী সরকারের ভারতের ওপর মজবুত নিয়ন্ত্রণ চাই, কিন্তু লুটনেওয়ালা দিল্লীর প্রয়োজন নেই। বহুচর্চিত সমস্যাগুলির সমাধান হোক। তখনই তার পরিণাম আমাদের সকলের কাছে সুখকর হবে।

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক)

কোটিপতি হোন

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090

9433359382

বিশেষ প্রতিবেদন

কংগ্রেসের ভোট রাজনীতির জন্যই অসমে বোড়ো এলাকায় দাঙ্গা

বিশেষ প্রতিনিধি॥ অসমে চার জেলা—কোকড়াঝাড়, উদালগুড়ি, চিরাংগ ও বক্সা বোড়ো এলাকা বলা হয়। এই এলাকায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের কারণে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে স্থানীয় বোড়ো জনজাতি ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষের স্থিতি তৈরি হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত অসমের সোনিয়া কংগ্রেস সরকার ভোটব্যাঙ্কের লালসায় এই অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ- কারীদের প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও সরকার এই অবৈধ বাংলাদেশীদের বহিষ্কারের কোনোরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বোড়ো অধিবাসীরা দীর্ঘসময় সংঘর্ষের পর এই এলাকায় 'বোড়ো ক্ষেত্রীয় পরিষদ' গঠনের জন্য সরকারকে বাধ্য করেছিল। এই পরিষদের জন্য নির্বাচন হয়ে থাকে। বর্তমানে এই পরিষদ বোড়ো পিপলস্ ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর দখলে আছে এবং এই পার্টি সোনিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে এখন অসম সরকারের শরিক। বিপিএফ-এর চন্দন ব্রহ্ম রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী এবং এবার লোকসভা ভোটে কোকড়াঝাড় আসনের প্রার্থী। এজন্য সোনিয়া কংগ্রেস এই সিটে কোনো প্রার্থী দাঁড় করায়নি।

গত মার্চ মাসের শেষের দিকে চিরাংগ জেলায় দুজন স্কুলছাত্রীকে বাংলাদেশী দুষ্কৃতীরা গণধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর একছাত্রীকে গলা কেটে হত্যা করে ও অপর ছাত্রী কোনোরকমে পালিয়ে গিয়ে গ্রামে এই ঘটনা জানিয়ে দেয়। প্রথমে প্রশাসন এই ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ছিল কিন্তু উত্তেজনা বাড়তে থাকায় পুলিশ চার যুবককে গ্রেপ্তার করে। বাকি অপরাধীদের ধরতে পুলিশ গড়িমসি করে। এর ফলে গত একমাস ধরে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি বোড়ো সমাজের আক্রোশ বাড়তে থাকে। মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশী মুসলমান ও বোড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে মারপিট ও একটা-দুটো

দাঙ্গা কবলিত এলাকায় আধা সামরিক বাহিনীর টহল।

হত্যার ঘটনা ঘটতে থাকে। এর মধ্যেই লোকসভা ভোটের কারণে পরিস্থিতি আরো অবনতি হতে শুরু করে। অখিল ভারতীয় বোড়ো ছাত্র পরিষদের অধ্যক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করে যে, রাজনৈতিক মেরুকরণের জন্য সোনিয়া-কংগ্রেস এরকম করছে ও এই ঘটনায় তাদেরই হাত থাকতে পারে। সকলের মনে আছে, ২০১২ সালের জুলাই মাসে স্থানীয় বোড়ো সমাজ ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হয়েছিল। আর এটা হয়েছিল বাংলাদেশী মুসলমানরা বোড়োদের আক্রমণ করার জন্য। ওই সংঘর্ষে অনেক লোক হতাহত হয়েছিল। স্থানীয় লোকেদের তীব্র বিরোধিতার ফলে তখন কিছু বাংলাদেশী মুসলমান নিজের দেশে ফিরে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু ভোটের ডঙ্কা বাজতেই সোনিয়া গান্ধীর দল তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং নানারকম আর্থিক সহায়তা দিতে শুরু করে। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ ও বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। মোটকথা, এই উত্তেজনাই সোনিয়া কংগ্রেসের ভোট-রাজনীতির সঞ্জীবনী। একটি প্রবাদ আছে— 'যদি গরিব না থাকে তাহলে বড়লোকরা কাদের কম্বল দান করে পুণ্য সঞ্চয় করবে? বড়লোকদের যদি পুণ্য অর্জন করতে হয় তাহলে গরিবকে তো গরিব করেই রাখতে হবে'। এরকম অসমে সোনিয়া-কংগ্রেসকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে বেআইনি বাংলাদেশী মুসলমানদের এনে বসাতেই হবে। বোড়ো ক্ষেত্রীয় পরিষদে যে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তা সোনিয়া-কংগ্রেসের জেনে-বুঝে

করা নীতিরই পরিণাম।

কিন্তু ভোটের কারণে এবার পরিস্থিতি আরো বিগড়ে গেছে। বিপিএফ-এর চন্দন ব্রহ্ম রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী ও এবার কোকড়াঝাড় সিটের প্রার্থী। কংগ্রেস আলাদাভাবে কাউকে দাঁড় করায়নি। তারা আশা করে বসে আছে যদি চন্দন ব্রহ্ম জিতে যায়, দিল্লীতে কংগ্রেসকেই সমর্থন করবে। কিন্তু সোনিয়া-কংগ্রেসের দুর্ভাগ্য, ভোটের পর জনসাধারণের ধারণা যে চন্দন ব্রহ্ম হেরে যাচ্ছে। নির্দলীয় প্রার্থী হীরা শরণিয়া জিততে পারে। এমনিতে শরণিয়া উলফার সমর্থক। অসমে এখন সোনিয়া-কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। বোড়ো এলাকায় বোড়ো সমাজ ও বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ আটকানোর জন্য সরকার বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি মনে করছে না। কেন্দ্রের কংগ্রেস ও অসম সরকার জানে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা বোড়ো ছাত্রীকে গণধর্ষণের কারণেই বোড়ো এলাকা বারুদের স্তূপ হয়ে আছে। এসব জেনে বুঝেও সরকার ভোটের জন্য চোখ বুজে আছে। যদি সরকারের এই উদ্দেশ্য না থাকতো তবে নিশ্চয় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বোড়ো সমাজের ক্রোধ শান্ত করার চেষ্টা করতো। ভাগ্যের জোরে অসমে সোনিয়া কংগ্রেস ও বোড়ো পিপলস্ ফ্রন্ট মিলিত ভাবে সরকার চালাচ্ছে। তাই এটা করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ ছিল। কিন্তু সরকার এটা না করে বারুদের স্তূপে ভোটের হাওয়া লাগিয়ে রাজনৈতিক লাভ ওঠানোর কাজ করে যাচ্ছে।

এখন যখন দেশে ভোটপর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে, সোনিয়া গান্ধীর পার্টির পরাজয়ের ঘণ্টা বেজে ওঠেছে, তখন এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, অসমের বারুদের স্তূপের আগুন আরো উসকে দেওয়া ছাড়া তাদের আর বিকল্প পথ নেই। কোকড়াঝাড়, চিরাংগ ও বক্সা জেলার লোকেরা বাংলাদেশী মুসলমানদের বাড়বাড়ন্তে খুবই ভয়ে ভয়ে আছে। এর জন্য একটি স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট ছিল। আর এই স্ফুলিঙ্গ প্রথম থেকে সরকারই হাতে রেখেছিল। বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম করেও বাংলাদেশী মুসলমানরা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতো। এই সংঘর্ষের লাভ কংগ্রেস দুই প্রকারে ওঠাতে পারে। এক, মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্থানীয় বোড়ো সমাজের আক্রোশের পিছনে নরেন্দ্র মোদীর হাত দেখতে পারে। প্রচার করা হয়, নরেন্দ্র মোদী মুসলমান বিরোধী। এজন্যই বোড়োদের মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে সাহস হয়েছে। দুই, এজন্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার কংগ্রেসের লাভ তোলা। বোড়ো এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ, দেশের অন্য অংশে ভোটের বাজারে কংগ্রেস তার লাভ ওঠানোর জন্য কাজে লাগাতে পারে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের বাপ-বেটাও ওই একই কাজ করেছে।

দাঙ্গার আগুন

যখনই কোকড়াঝাড় ও চিরাংগে বোড়ো ও বাংলাদেশী মুসলমানদের সংঘর্ষ শুরু হয় ও কিছু লোক মারা যায়— তারপর এক মুহূর্তও দেরি না করে কংগ্রেসের ছোট-বড় সব নেতা বলতে শুরু করে যে নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশী মুসলমানদের বহিষ্কার করার কথা বলার জন্যই বোড়ো এলাকায় সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আর এই ইস্যুতে মোদীকে শাস্তি দেওয়া যাবে--- এই আনন্দে তারা মশগুল। এক ধাপ এগিয়ে তারা বলতে শুরু করেছে, যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ বাংলাদেশী মুসলমানদের গায়ে আঁচড় তারা লাগতে দেবে না। সোনিয়া-কংগ্রেসের সঙ্কেত পরিষ্কার--- তারা বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর জন্য যদি এত কিছু করতে পারে, তাহলে এদেশের মুসলমানদের জন্য আরো কত কিনা করতে পারে। ভারতের মুসলমানদের জন্য তারা তো করছেই। ভোটের জন্য কংগ্রেসদল মুসলমান তোষণে কত নীচে নামতে পারে অসমের সংঘর্ষের একটা উদাহরণই যথেষ্ট।

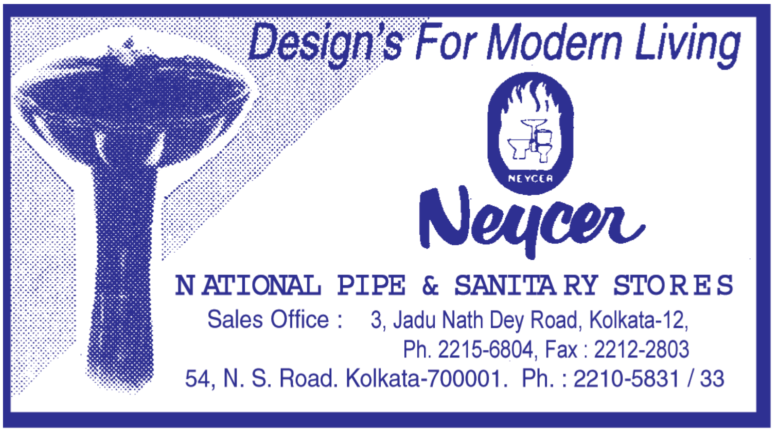

পাঞ্জাবের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল ১৮৫৭-র মহাসংগ্রাম দমনের আরও কিছু ভয়ঙ্কর তথ্য

বিশেষ প্রতিনিধি।। দশ জন করে সিপাইকে ডাকা হলো প্রত্যেকবার। তাদের নাম লেখা হলো। তারপর একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো হত্যার জন্যে। বন্দুক হাতে হত্যাকারীরা দাঁড়িয়ে আছে। এরকমই বিবরণ লিখেছেন ১৮৫৭ সালের ১ আগস্টের নির্মম গণহত্যার। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডরিক হেনরি কুপার নথিবদ্ধ করেছেন সেই ঘটনা। ঠাণ্ডা মাথায় একেবারে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছিল ২৮২ জন এদেশী সিপাইকে। ১৮৫৭ সালের মহা সংগ্রামকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল না ওইসময়ে কীভাবে সিপাইদের হত্যা করেছিল ইংরেজ শাসকরা।

খনন কাজের ফলে পাওয়া মাথার খুলি ও হাড়গোড়।

হত্যার পর গর্ত করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল মৃতদেহগুলো। সব তথ্য মিলেছে কিছুদিন আগে— দেড়শো বছরের বেশি সময় বাদে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পাঞ্জাবের আজনালাতে খোঁড়াখুঁড়ি করে পাওয়া গেছে দেশের প্রথম স্বাধীনতা যোদ্ধাদের দেহাবশিষ্ট। বৃটিশ সরকার কীরকম ছক কষে নারকীয় ভঙ্গিতে গণহত্যা করেছিল তার বিবরণ উঠে এসেছে। এটা যেন অনেকটাই ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালা বাগে যা ঘটেছিল তার মতোই নির্মম। তফাত একটাই জালিয়াওয়ালা বাগের ঘটনা গোপন রাখা সম্ভব হয়নি বৃটিশদের পক্ষে। ১৮৫৭ সালের গণহত্যার ঘটনা মাটির নিচে চাপা পড়েছিল এতবছর। সুরিন্দর কোছার নামে ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু এক নিবেদিত কর্মী অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন অবহেলিত যেসব স্মারক ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় যা রয়েছে তার খোঁজ নেওয়ার। সেই ভাবনা থেকেই খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছিল কালিয়ানওয়ালা খু (কালো মানুষদের কুয়ো)। বহুকাল আগে তৈরি ইঁট দিয়ে গাঁথা কুয়োর কথা ভুলেই গিয়েছিল অমৃতসর শহরের মানুষ। দিনে দিনে নগর বেড়েছে। এখন খোঁড়াখুঁড়ির পর ইতিহাসের অন্য তথ্য মিলছে প্রমাণ সহ।

পাওয়া গেছে ৯০টা মানুষের মাথার খুলি। প্রায় ২০০টা চোয়াল। এছাড়া কয়েক হাজার হাড়ের টুকরো। ২৮২ জন অসমসাহসী সৈনিককে হত্যা করে ওইখানে চাপা দেওয়া হয়েছিল। এই সিপাইরা কোথাকার তাও জানা গেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ২৬ নম্বর এন আই (নেটিভ ইনফ্যানট্রি) সৈনিক। যারা ১৮৫৭ সালের ৩১ জুলাই লাহোরের মিয়ান মির ক্যান্টমেন্টের বন্দীশালা থেকে পালিয়েছিল। বৃটিশ শাসকরা তাদের ধরার পর বেশি সময় নেয়নি চরম সিদ্ধান্ত নিতে। তিনটে কুয়োর মধ্যে শহীদদের মৃতদেহ ফেলে মাটি চাপা দিয়েছিল। সুরিন্দার কোছার বলেছেন, 'ঘটনার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।' আর এই ঘটনার কথা গর্বের সঙ্গে লিখেছেন ইংরেজ শাসকরা। ফ্রেডারিক হেনরি কুপার ১৮৫৮ সালে একটা বই লেখেন : 'দ্য ক্রাইসিস ইন দি পাঞ্জাব— ফ্রম মে ১০ আনটিল দ্য ফল অফ দিল্লী'। ওই বিবরণ পাওয়া গেছে বৃটিশ হাউস অফ কমনস-এর লেখ্যাগারে। তাছাড়া ১৮৮৩ থেকে ১৯৪৭-এর মার্চে প্রকাশিত অমৃতসর জেলা গেজেটিয়ারে চারটি সংস্করণে 'কালিয়াওয়ালা খু'-এর উল্লেখ রয়েছে।

কুপারের বিবরণ থেকে জানা যায় ২৩৭ জন সৈনিকের পরিচয় যাদের বলা হয়েছে পুরবৈয়া। এসেছিল উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল আর বিহার থেকে। এর মধ্যে ৪৫ জনকে হত্যা করতে হয়নি তারা দম বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে আজনালা থানার লাগোয়া বন্ধ ঘরে থাকার সময়। ৪১ জন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়েছিল। তাদের ধরে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ফ্রেডারিক কুপারের ওই নারকীয় কাজের

নিন্দা করেন বৃটেনের সাধারণ নাগরিকরা। ১৮৫৯ সালের ১৪ মার্চ বৃটিশ সাংসদ চার্লস গিপলিন হাউস অফ কমনসে ওই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'এতো পুরোপুরি জান্তব আচরণ।' কিন্তু সরকারি ভাবে ওই ঘটনার কথা স্বীকার করে কোনো তদন্তের নির্দেশ দেয়নি বৃটিশ সরকার। কারণ তাতে তাদের নৃশংসতা প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল।

প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন কোছার। কিন্তু কোনো সরকারি মহল থেকে তিনি সহযোগিতা পাচ্ছেন না। তিনি বলেছেন, 'সুযোগ্য আধিকারিকরা নীরব। প্রধান সমস্যা হলো কুপারের বিবরণী থেকে কোন কূপ ও অন্যান্য তথ্য মিলছে না নির্দিষ্ট জায়গায়। কোছার বলছেন, মৃতদেহ পোঁতা হয়েছিল শহীদগঞ্জের গুরুদ্বারার পাশের মাঠে। ওই গুরুদ্বারা তৈরি হয় ১৯৪৭ সালে।

ধর্মস্থানের নিচে ওইভাবে শহীদদের মৃতদেহ চাপা থাকতে পারে--- এই অনুমানকে প্রথমে আমল দেওয়া হয়নি। তারপর ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে গুরুদ্বারা কর্তৃপক্ষ রাজি হন খোঁড়াখুঁড়িতে। কয়েকজন ঐতিহাসিক থাকেন। ১০ ফুট নিচে পাওয়া যায় কূপ। ইট দিয়ে গাঁথা। জনগণ সাহায্য করেন এবং ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। সেই টাকা দিয়ে অন্য জায়গায় ধর্মস্থান সরিয়ে নেওয়ার পর অনুসন্ধান শুরু হয়।

প্রায় যুদ্ধের মতো তৎপরতায় খননকাজ শুরু হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে একটা পূর্ণ শরীরের কঙ্কাল পাওয়া যায় একটা হাত তোলা— মাটির আট ফুট নিচে। তার নিচে মেলে গাদা গাদা কঙ্কাল। দুদিনের মধ্যে আরও কঙ্কাল পাওয়া যায়। আজনালার অধিবাসীরা কেউই চোখের জল রোধ করতে পারেননি। এত কঙ্কাল পাওয়া গেছে ঠিকই কিন্তু তার ফরেনসিক পরীক্ষার কোনো উপায় নেই। প্রায় ফসিল হয়ে যাওয়া কঙ্কাল থেকে কোন তথ্য মিলবে? এই খননকাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের সহযোগিতা এবং সমর্থন মেলেনি। অনভিজ্ঞ গ্রামীণ লোকদের নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি কাজ চলেছে। পাঞ্জাবের মহাফেজখানা ও পুরাতত্ত্ববিভাগের প্রধান নভোজৎ রানধাওয়া কোনোরকম আগ্রহে দেখাননি খোঁড়ার কাজে।

গাড়গোড় পরীক্ষা করছেন সুরিন্দর কোছার।

ইতিহাসবিদ ও শহিদগঞ্জ গুরুদ্বারের পরিচালন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ১৮০টি চিঠি পাঠানো হয়েছে দেশের বিশিষ্ট পদাধিকারীদের। তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সেনাবাহিনীর প্রধান। কিন্তু কারও কাছ থেকে উত্তর মেলেনি।

মাটির তলায় কালিয়ানওয়ালা খু।

২৬ নম্বর নেটিভ ইনফ্যানট্রির যেসব সৈনিকের কঙ্কাল মিলেছে তা দেখে সনাক্ত করা কঠিন, কারণ প্রমাণ নেই কোনো। তবে পাওয়া গেছে কিছু নিদর্শন। ৭০ টা এক টাকার স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছাপ দেওয়া। বীরত্ব পদক এবং কিছু ব্যক্তিগত গয়না। তা রাখা হয়েছে গুরুদ্বারে। পাঁচ সদস্যের এক কমিটি ঠিক করেছে পাঞ্জাব সরকার। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন খনন করে যা পাওয়া গেছে তা সম্বন্ধে। অনেক রকম ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার আছে মৃত সৈনিকদের যথাযথ পরিচয় পাওয়ার জন্য।

দেড়শো বছরের বেশি সময় আগে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী ২৬ নম্বর নেটিভ ইনফ্যাট্রির ৭০০ সদস্যের ভিতর ৫০০ ভারতীয়কে চিহ্নিত করে মেরে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। এরকম একটা ঘটনার প্রমাণ যথেষ্ট মিলেছে কিন্তু যেরকম আগ্রহ নানাস্থানে দেখা যাবে আশা করা গিয়েছিল তা মেলেনি। ভারতের রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে কোনো সাড়া দেননি। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল বলেছেন, একটা স্মারক নির্মাণের ব্যয় সরকার বহন করবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দার সিং বলেছেন, সৈন্যদের মরণোত্তর সৈনিক সম্মান দেওয়া হোক। কিন্তু সব ঘটনাই চাপা পড়ে গেছে ভোটের ডঙ্কানিনাদের সঙ্গে।

তথ্যসূত্র : 'ইন্ডিয়া টু ডে'

অ্যায়সা মার্ মারত কি অভিতক রওয়ত

অমলেশ মিশ্র

ভারতবর্ষের ১৬ তম লোকসভা নির্বাচন ৭ এপ্রিল শুরু হয়ে শেষ হবে ১২ মে। এই বছরই ২০১৪ সালের ১৬ মে আমরা জানতে পারব যে আগামী ৫ বছর ভারতবর্ষের শাসন ভার কাদের দখলে আসবে এবং কোন দিশায় চলবে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছেন যে, এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে সরকার গঠন করতে পারে। এই সম্ভাবনায় সবিশেষ বিচলিত তৃণমূল কংগ্রেস এবং তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি। কংগ্রেস বিচলিত হলেও গণতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়মে এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হলে মেনেই নেবে। কিন্তু বারগেইনার (Burgainer) ছোট ও আঞ্চলিক দলগুলি এটা হজম করতে পারছে না। বামদলগুলি ঘোষণাই করেছে যে, ২০০৪ সালে তারা ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকেই সমর্থন করেছিল, এবারেও তাই করতে পারে।

কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বামদলগুলি এবং অন্যা কিছু দল— বিজেপি-র বিরুদ্ধে ঐক্যমত্য স্থাপন করেছে। এই দলগুলির প্রচারের মুখ্য বিষয় হলো ১৯৯২ সালের রামমন্দির—বাবরি ধাঁচা ভেঙে দেওয়া ও ২০০২ সালে গুজরাট রাজ্যের দাঙ্গা। একটি ২২ বছরের এবং আর একটি ১২ বছরের পুরানো ঘটনা। ইতিমধ্যে পৃথিবী- ব্যাপী বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকী আবহাওয়ারও গুরুভার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তারা ওই ২২ এবং ১২ বছরের পুরানো ঘটনা ভুলতে পারছে না। বাবরি ধাঁচা ধ্বংস হওয়ায় তারা ভীষণ ব্যথিত— আজও কান্না থামেনি। গুজরাটের গোধরায় ট্রেনে ৪৬ জন করসেবককে পুড়িয়ে মারার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যে দাঙ্গা হয়েছিল সেটিও তারা ভুলতে পারেননি। কাঁদছে আর বলছে এহেন বিজেপি-কে কেউ ভোট দিও না। এদের মতে বাবরি মসজিদ ভেঙে হিন্দু জাতীয়তা ও স্বাভিমান প্রকাশ অভিপ্রেত নয়, নিন্দনীয়। আর হিন্দু হত্যার প্রতিক্রিয়ায় অন্য সম্প্রদায়ের কারুর গায়ে হাত ওঠানো আরও খারাপ। গান্ধীজী বারবার এই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সারা জীবন চালিয়ে গেছেন— আর এখন এরা গান্ধীজীর অন্যান্য কথা অমান্য করলেও এই গান্ধীবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা আজও অনুসরণ করে। এতে ভোট পাওয়া যায়, ক্ষমতায় যাওয়া যায়। তাই তারা নির্বাচন এলেই কাঁদতে আরম্ভ করে, আর কেঁদেই চলে। এদের এই কান্নাকাটি দেখে আমার সেই গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকটির কথা মনে পড়ে— যে মহরমের মিছিলের মানুষদের কাঁদতে দেখে মন্তব্য করেছিল— অ্যায়সা মার্ মারত, অভিতক রওয়ত। এমন মার মেরেছে যে আজও কাঁদছে?

যাইহোক, এই অতিশয় শোকাবহ ঘটনার স্মৃতিতে আজও মহর্‌রম মাসের ১০ তারিখে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা শোকানুষ্ঠান করেন। (এখন অনেক সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরাও এই শোকানুষ্ঠান পালন করেন।) এই দিন যুদ্ধক্ষেত্র ও ধর্মীয় নানা প্রতীক নিয়ে শোভাযাত্রা হয়। অংশগ্রহণকারীরা হায় হুসেন, হায় হুসেন, হায় আলি ধ্বনি দিয়ে বক্ষে করাঘাত বা অস্ত্রাঘাত করেন ও ক্রন্দন করেন। মহর্‌রম-এর মিছিলের কান্না দেখে আমার সঙ্গী মন্তব্য করেছিল— এমন মার মেরেছে যে আজও কাঁদছে। (৬৮০ খৃস্টাব্দ থেকে ২০০০ খৃস্টাব্দ খুব কম সময় নয়।)

কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং তথাকথিত বামপন্থীরা আজও সেই ১৯৯২ ও ২০০২ সালের ঘটনা নিয়ে নির্বাচন এলেই কাঁদতে শুরু করে। ওই দুই ঘটনায় কি কংগ্রেস, তৃণমূল ও বামেরা এমন মার খেয়েছিল যে আজও নির্বাচন এলে তারা কাঁদে। হুসেন-এর প্রতি শ্রদ্ধায় ও আন্তরিকতায় মুসলমানরা ওই দিনটিতে ক্রন্দন করেন। আর এই রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের প্রতি আন্তরিকতায় নয়, ভোটের লালসায় এই কান্না কাঁদেন।

এই দলগুলি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে চূড়ান্ত হিন্দু-বিদ্বেষী। হিন্দু ভোট বিভাজিত। তাই এই সঙ্ঘবদ্ধ ভোটের প্রতিই ওদের লোভ। এরা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে বোঝেন— হিন্দু বিরোধিতা ও মুসলমান তোষণ। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার স্বাভাবিক তাৎপর্য হলো— সকলের প্রতি ন্যায়, কারুর প্রতি তোষণ নয়। 'Justice to all and appeesement to none'। একমাত্র হিন্দুরা অর্থাৎ সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই ধর্মনিরপেক্ষ। এটা হিন্দুদের ছয় হাজার বছরের শিক্ষা ও সংস্কার। হিন্দুরা ধর্মে উদার, আচার-বিচারে গোঁড়া। অন্যরা ধর্মে গোঁড়া, আচারে-বিচারে উদার।

মুসলমান ভোট অবিভাজিত ভাবে পাওয়ার লালসায় এরা মাথায় কাপড় জড়িয়ে নামাজ পড়ে, ইমাম ও মোয়াজ্জিমদের ভাতা দেয়, হজ যাওয়ার জন্য অনুদান দেয়, হাজার হাজার মক্তব-মাদ্রাসা বানায়,মুসলমানদের চাকুরিতে সংরক্ষণ-এর দাবি তোলে। ইমামের 'ফতোয়া' ভিক্ষা করে। এরা মুসলমানদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় সমর্থ হওয়ায় পরামর্শ দেয় না, বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনে সীমারক্ষার কথা বলে না। এরা মুসলমান সমাজকে অনুদানজীবী রেখে ভোট কুড়াতে চায়।

সারা পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, এরা ১৯৯২ আর ২০০২ নিয়ে এখনও কেঁদে চলেছে।

'আদর্শ শিক্ষক'

তুফান মাহাত॥ গত ৪৪ বছর ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত তিনি। এর মাধ্যমেই তিনি সকলের কাছে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। সূর্য ওঠা থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তাঁর ধ্যান-জ্ঞান শুধু তাঁর স্কুল। শুধু একটাই চিন্তা তাঁর মাথায় ক্রমশ ঘুরপাক খায়। অশিক্ষা, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা যেন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। আর ১৯৭০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেই একই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন শিক্ষক হিমাংশু ঘোষ।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লাউদহ গ্রামের রোহিণী চক্রের অন্তর্গত সাতকুলি আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিমাংশু ঘোষ। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া বনবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের। তপশিলি জাতি, উপজাতি অধ্যুষিত এই এলাকায় শিক্ষার বাতাবরণ সৃষ্টি করাই তাঁর প্রধান কাজ। অভাব, অনটন, অশিক্ষায় ভরে থাকা লাউদহ গ্রামকে সকলের কাছে এক দৃষ্টান্ত হিসাবে গড়ে তুলেছেন এই হিমাংশু মাস্টার। তাঁর কথায়, ''এখন শুধু শিক্ষাগ্রহণের সারবত্তা ও শিক্ষান্তে কর্মরত হয়ে কথা পৌঁছে দেওয়াই জরুরি। বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি স্বামীজীর আদর্শকে পাথেয় করে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাবো এলাকার গরিব তপশিলি জাতি, উপজাতিভুক্ত মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক মান উন্নয়নকল্পে।'' সুতরাং যে শিক্ষকের গলায় এই আত্মপ্রত্যয়ের সুর শোনা যায় সেই স্কুলে এবং গ্রামের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী আজ বুঝতে পেরেছে শিক্ষক মানেই চোখরাঙানি নয়, ভবিষ্যৎ তৈরির তিনি প্রকৃত কারিগর।

সকাল হলেই যে গ্রামে চোখে পড়ত শিশুদের শুধু মাঠে খেলাধুলা করতে বা কাজ করতে, আবার সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে খেয়ে শুধু ঘুমোতে— সেই চিত্র আজ অনেকটাই পাল্টেছে। সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত বই, খাতা, পেন নিয়ে পড়তে বসা, স্কুলের সময় ব্যাগ কাঁধে স্কুলে যাওয়া— এই সবই সম্ভব হয়েছে হিমাংশুবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে। ১৯৭০-এ চালু হলেও ১৯৭৩-এ সরকারি স্বীকৃতি পায় সাঁতকুলির এই স্কুল। এরপর আর পিছেন ফিরে তাকাতে হয়নি হিমাংশুবাবুকে। যখনই তিনি ছোটখাটো সমস্যায় পড়েছেন তখনই নিজের মনকে শক্ত করে সাহসের ওপর ভর করে খুব সহজেই তা সমাধান করেছেন।

?????

তবে এই স্কুল এবং এই গ্রামের প্রতি হিমাংশুবাবুর যে অনন্ত ভালোবাসা তার বিবরণ দিতে গেলে পাতা ভরে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাঁর কৃতকর্মের ছোট্ট নমুনা তুলে ধরছি। যথা— সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, খেলার মাঠ তৈরি, বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন (প্রতি বছর), পানীয় জলের সুব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ করে 'স্কুল চলো' অভিযানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত করণ, শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যালয়ে প্রথমবার ভিক্ষালব্ধ ও সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থে বিদ্যালয়টিকে পাকাঘরে পরিণত করা। খড়্গপুর আই আই টি ছাত্র-ছাত্রীদের এন এস এস শিবিরের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গাতে একটি পুকুর খননের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়া বিশেষ উদ্যোগে বিদ্যালয়ের জন্য ১ একর ৫৭ শতক জমি সংগ্রহ, ১৯৯৭ সালে বিদ্যালয়ে রজতজয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানের আয়োজন ও স্মরণিকা প্রকাশ করা। পরীক্ষাতে ভাল ফল লাভের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি ও বৃত্তি পরীক্ষা, জেলাগত ভাবে বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে প্রতিবছর এই বিদ্যালয় কৃতিত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। ২০০৪ সালে ১৯০০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শিশু উৎসব ও চরিত্রগঠনের মাধ্যমে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ, দুঃস্থ ও কৃতী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা প্রদান, গরিব দুঃস্থ ছাত্রদের শীতবস্ত্র ও কম্বল দান। ছাত্র-ছাত্রীদের সপ্তাহে দু'দিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা। এছাড়া তাঁর এই সমস্ত কাজের মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় হলো পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সহযোগিতায় বনবাসীদের মধ্যে ডাইনী, তেলখড়ি, গুনিন, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, ড্রাগের নেশায় আসক্ত, অপুষ্টিজনিত রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। এই সমস্ত কিছুর নিরিখে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি কল্পে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে এই বিদ্যালয় ১৪ লক্ষ টাকা সরকারি সাহায্য পায়।

তবে শিক্ষক হিমাংশু ঘোষের এই ৪৪ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ২০১২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে শিক্ষার বিস্তার-সহ সমাজ কল্যাণে ব্রতী থাকার কারণে জাতীয় শিক্ষকের বিরল সম্মান পাওয়া। এ থেকেই বোঝা যায় দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তাঁর এই সম্মান আরও বড় কোনো পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে, যা আগামীদিনে আরও অনেক শিক্ষককে হিমাংশুবাবুর মতো দেশ গঠনের পথে হাঁটতে দেখা যাবে।

ভাল থাকার রহস্য

রমেশ চন্দ্র দাস

অধুনা শারীরিক সুস্থতার দিকে লক্ষ্য না রেখে আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে চমকপ্রদ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের ধুম পড়ে গিয়েছে। প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থানের ফলে পায়ে হেঁটে চলাফেরা একেবারে বন্ধপ্রায়। যান্ত্রিক যুগে বিভিন্ন যন্ত্রাদি ব্যবহারে কার্য সম্পন্ন হওয়ায় কায়িক শ্রমের অভাবে শরীর অলস হয়ে পড়ে। নানারকম রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। কিছু না খেলে চলে না ভেবে জোর করে খেলে হজম হয় না। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হাওয়ায় মাথাব্যথা অনুভূত হয় এবং মুখের স্বাদ বিকৃত হয়ে যায়। অবশেষে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে ঔষধ খেতে খেতে শরীর জর্জরিত হয়ে পড়ে।

এই জর্জরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ ও সরল উপায় আমাদের নাগালের মধ্যে থেকেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। তা হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত জল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে আমরা অনেকেই এই সস্তা ও সুলভ জল পান করতেও কার্পণ্য করে থাকি। অধিক পরিমাণে জল পানের ফলে শরীরের অদৃশ্য এবং দূষিত পদার্থের নির্গমে সুস্থ শরীর নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়। প্রচুর পরিমাণে জল পানের রহস্য অনেকের অজ্ঞাত থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অন্যান্য উপসর্গে ভোগেন। ধূম্রপায়ীদের জন্যও সুখবর যে, যখন ধূমপানের ইচ্ছা হবে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচুর পরিমাণে গলা অবধি জল পান করে অন্য মনস্ক হয়ে যে কোনো কাজে মনকে নিবিষ্ট করলে ধূমপান থেকে সামুহিক নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। মোট কথা তৃষ্ণা নিবারণ ছাড়াও অধিক পরিমাণে জল পান করার অভ্যাসে স্বল্প সময়ের মধ্যে অপরূপ আনন্দ অনুভব হবে এবং দেহের ক্লান্তিও দূর হবে।

এছাড়াও অন্যতম উপায় হিসাবে মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্র অনুসারে 'অনুলোম-বিলোম' প্রাণায়ামের ন্যায় 'কপালভাতি' প্রাণায়ামও অত্যন্ত লাভদায়ক। 'প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য' অর্থাৎ পেটে অবস্থিত নিরন্তর বায়ুকে নাসিকা দ্বারা ঝটকায় নিষ্কাশিত করা এবং পূর্ণ শ্বাস নিষ্ক্রমণের পর সাধ্যানুসারে পেটকে অবরুদ্ধ রাখা।

কপালভাতি প্রাণায়ামে প্রথমে খালি পেটে পদ্মাসনে অথবা সাধারণ আসনে বসে দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখতে হবে। কোমলতাপূর্বক চোখ মুদ্রিত করে মেরুদণ্ড এবং ঘাড় সোজা রাখতে হবে। মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার ভাব থাকবে। তৎপশ্চাৎ নাসিকা দ্বারা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে মূলবন্ধ (অর্থাৎ মলদ্বারকে সঙ্কুচিত করতে হবে) লাগাতে হবে। তারপর সেই গৃহীত শ্বাসকে শনৈঃ শনৈঃ ঝটকায় ঝটকায় নিষ্কাশিত করতে হবে এবং দেখতে হবে যে কেবলমাত্র পেডু অর্থাৎ নাভির তলদেশ যেন প্রভাবিত হয়। নিরন্তর এই প্রক্রিয়ায় এক আবৃত্তি থেকে অন্য আবৃত্তিতে ক্ষণিক বিলম্ব হবে, যার ফলে স্বাভাবিক রূপে সামান্য শ্বাস ভেতরে যাবে। পৃথকভাবে শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং ঝটকা দিয়ে শ্বাস নিষ্কাশনের ক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এইভাবে অভ্যাস করতে করতে ঝটকা দিয়ে শ্বাস বাইরে নিক্ষেপ করার শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং শ্বাস নিষ্কাশন আবৃত্তির সংখ্যা ক্রমশ ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০ এবং সাধ্যানুসার আরও অধিক বৃদ্ধি হবে। তৎপশ্চাৎ পূর্ণ শ্বাস বাইরে নিষ্কাশনের পর শ্রান্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উড্ডিয়ান বন্ধ (নাভিমূলকে মেরুদণ্ডের সঙ্গে লাগানো) এবং জলন্ধর বন্ধ (থুঁতিনিকে বুকে লাগিয়ে গলদেশ সংকুচন) লাগিয়ে সাধ্যানুসারে কিছুক্ষণ শ্বাসকে বাইরে রুখতে হবে, যার ফলে বাহ্যিক কুম্ভক উৎপন্ন হবে। তৎপশ্চাৎ শ্বাস রুখতে না পারার স্থিতিতে প্রথমে উড্ডিয়ান বন্ধ— পেট ঢিলা করে, জলন্ধর বন্ধ— ঘাড় সোজা হবে এবং শেষে মূলবন্ধ খুলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

এই কপালভাতি প্রাণায়ামে গৃহীত শ্বাসকে ঝটকা দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ বাইরে নিষ্কাশনের ফলে অভ্যন্তরের যাবতীয় অদৃশ্য এবং দূষিত পদার্থের নির্গমে শরীর সুস্থ থাকে। ফুসফুসে শুদ্ধ অক্সিজেন প্রাপ্ত হওয়ায় রক্তশোধন ক্রিয়া তীব্র হয় এবং শরীরের রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয়। শ্বাস প্রণালী স্বচ্ছ হয়ে নিয়মিত কার্য করতে থাকে। বিচারশক্তি এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে এই প্রাণায়ামে অদ্ভুত ক্ষমতা নিহিত আছে। উদ্বিগ্ন মনকে শান্ত করে। শরীরে কোনো ব্যাধি প্রবেশ করতে পারে না আর যদি পূর্ব থেকেই বাসা বেঁধে থাকে, তবে তা নিরাময় হবে। মোট কথা, পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিতভাবে এই প্রাণায়াম শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য বিশেষ উপযোগী। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সুপাচ্য এবং নিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

সংসারের যাবতীয় কাজের ফাঁকে, স্বাস্থ্যই সম্পদ মনে রেখে আমরা যদি উপরোক্ত প্রণালী আমাদের নিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ অন্যদেরও উৎসাহিত করি তবে হয়তো পরস্পরের সাক্ষাতে সগর্বে সহাস্য বদনে বলতে পারবো যে— খুব ভাল আছি।

(লেখক একজন যোগবিশেষজ্ঞ)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা

"কিছু সম্পর্ক এমন হয় যা কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার এইরকমই সম্পর্ক ছিল। বড় দাদার মতো তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা সবসময় ঘিরে রাখতো। 'অনামিকা' নাট্যসংস্থার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও সাহিত্যিক -সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় যোগদান সবসময় প্রেরণা ও উৎসাহদান করতো।" —গত ৪ মে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ে আয়োজিত 'আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা'র নবম বার্ষিকীতে কথাগুলি বলেন প্রখ্যাত বিদুষী তথা নাট্যগবেষণা সংস্থা ও 'অনামিকা'-র নির্দেশক ড. প্রতিভা আগরওয়াল। স্মৃতি ব্যাখ্যানমালায় তিনি প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব তথা 'অনামিকা'র সভাপতি বিমল লাঠ। স্মৃতিচারণে তিনি বলেন— 'আচার্য শাস্ত্রী তাঁকে হাত ধরে সাহিত্যিক-সামাজিক ক্ষেত্রে চলতে শিখিয়েছেন। তাঁর কবিতা ও দরাজ হাসির শব্দ আজও কানে বাজে।'

কার্যক্রম পরিচালনা করেন ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগলকিশোর জৈথলিয়া। মঞ্চে কলকাতার বহু সাহিত্যপ্রেমী, মান্যগণ্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির রক্তদান শিবির

গত ২৭ এপ্রিল হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির উদ্যোগে কলকাতার কেশব ভবনে গত ২৭ এপ্রিল একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৫০ জন রক্তদান করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রপ্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত রক্তদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। বরিষ্ঠ প্রচারক কেশব দীক্ষিত সবাইকে উৎসাহদান করেন।

কাঞ্চনতার শাখার বার্ষিক উৎসব

মালদহ জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাঞ্চনতার শাখার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হলো গত ২৭ এপ্রিল। অনুষ্ঠানে ১৩৭ জন স্বয়ংসেবক শাখার বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন— সূর্যনমস্কার, যোগাসন, নিযুদ্ধ, দণ্ড ও গোপুরম্ প্রদর্শন করে। কার্যক্রমে প্রধান পরিদর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা সহ-কার্যবাহ শ্যামল পাল। উল্লেখ্য, শাখার এই কার্যক্রমে কাঞ্চনতার গ্রামের প্রায় সমস্ত গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর জেলা শারীরিক প্রমুখ ইন্দ্রনাথ রায়ের মাতৃদেবী অনিতা রায় গত ২৬ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

ব্যারাকপুর নগরের স্বস্তিকার পাঠক ও শান্তিবাজারের বস্ত্রব্যবসায়ী পরেশ চন্দ্র সাহা গত ১ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি এক পুত্র, এক কন্যা, নাতি-নাতনি ও বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি রেখে গেছেন।

নারীর অধিকার—মানুষের সমাজ : একটি আলোচনা

সলিল বেজ

নারীর অধিকার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, এইসব শব্দ-বিন্যাস এখন প্রায়শ মানুষের মুখে, কাগজের বুকে, সভা-সেমিনারে, মিছিলে- মাইকে, অনেক সময়ই আমাদের সামনে আসে। কিছু তার বাস্তবের মাটিতে শেকড় প্রবেশ করাতে পারে, কিছু থেকে যায় বায়বীয় অবস্থানে। মানুষ আমরা আজ জীবনের প্রায় সমস্ত অঙ্গনেই নিজের নিজের স্বার্থবুদ্ধিকে কোলে রেখে, যখন যেমন প্রয়োজন ওদের নিয়ে নাড়াচাড়া করি। ...আসুন আমাদের এই বাস্তবের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে, সমাজে দেশে তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীর প্রকৃত অবস্থানের অতীত, বর্তমান এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে, এ ক্ষুদ্র নিবন্ধের পরিসরে যতটুকু সম্ভব, অন্তত ততটুকু দৃষ্টি দিই।

সে এক ভারতবর্ষ ছিল, যখন নারী ও পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক অঙ্গনে সদর, অন্দরে বিচরণের একটি শক্ত-পোক্ত সীমাবেড়া ছিল। অবশ্যই বুঝে নিতে হবে যে, রীতি-নীতির সে ঘেরাটোপ, সমাজ, সংসার, দেশ, কালের ঊর্ধ্বে অবস্থানের অসাধারণ এবং অসাধারণদের ক্ষেত্রে সেভাবে আরোপিত হোত না। অর্থাৎ বিষয়-বুদ্ধি-বর্জিত, সংসারত্যাগী, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা শূন্য, ঈশ্বরে অর্পিত প্রাণমন এবং ঈশ্বর সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ও জীবনের প্রতি সমদর্শীদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেভাবে খাটত না। একদিকে যুগাবতার, ঋষি ও ঋষিকল্পগণের যেমন সদর-অন্দরে গতায়াতে সামাজিক বিধিভঙ্গের প্রশ্ন উঠত না, ঠিক তেমনি গার্গী, মৈত্রেয়ী, পদ্মাবতী প্রমুখের মতো অসাধারণরাও প্রয়োজনে রাজসভাতেও উপস্থিত হতে পারতেন স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে, সে ভারতবর্ষ আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকের ভারতভূমিতে দাঁড়িয়েই আমাদের ভেবে দেখতে হবে, নারীর অধিকার প্রাপ্তি তথা স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে পুরুষের স্বার্থ-সম্পৃক্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার জড়িত থাকছে কিনা এবং সেক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধাভোগী কি নারী অথবা পুরুষই। বিষয়টির উপর গভীর চিন্তন-মননে, বর্তমান সামাজিক রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে যথাযথ দৃষ্টি দিলে যা উঠে আসে, তা হলো, আমাদের সে পরিকাঠামো আজ অনেকখানিই বলা যেতে পারে, ভঙ্গুর, এলোমেলো এবং পরিত্যক্ত হতে যাওয়া অবস্থানে। সেখানে যদিও পুরুষতান্ত্রিকতার আধিপত্যই সমধিক, তবু লক্ষণীয় বিষয় হলো, নারীকে এখন আর 'অবলা'/'দুর্বলা' ইত্যাকার আখ্যায় ভূষিত করা যাচ্ছে না। সমগ্র দেশের পাশ্চাত্যানুসারী শিক্ষা-দীক্ষা নারীকে তার অন্দর-আবাস থেকে বহিরাঙ্গনে পৌঁছোনোর সুযোগ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে, অতীতের সঙ্গে তুলনামুলক বিচারে, অনেকটাই বেশি। এখানে অবশ্য একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, অধিকার অর্জন তথা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে 'অর্জিত' এবং মিলিজুলি আঁতাতে 'দানকৃত'-এর কোনো সম্পর্ককে কোনো প্রকার মান্যতা দেওয়া উচিত কিনা। ...সেক্ষেত্রে বাস্তব কথাটি হলো, জীবনের সমস্তরকম স্বাধীনতার অঙ্গনে পারস্পরিক সহাবস্থান এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও, সেখানে 'দয়ার দান'-এর মতো কোনো ব্যাপারই যুক্তি-গ্রাহ্য হতে পারে না। বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার করেই বলি,... 'উ-বাবু' চাকরি করেন। স্ত্রী 'সু-দেবী'কেও চাকরি করার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ এবং সহযোগিতা দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার মজার ব্যাপারটি হলো, অফিস যাওয়ার আগে এবং অফিস থেকে ফিরে হাঁড়ি-হেঁসেল, ঘর-দোর সবেরই সিংহভাগ কিন্তু সামলাতে হয় 'সু-দেবী'-কেই। তারপর, নিযুক্ত-আয়ার নির্দিষ্ট সময়কালের পরে, ছেলে/মেয়ে সামলানোর দায়িত্বও 'সু-দেবী'-র। বোধ করি ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার ভাবা উচিত, স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারীর অধিকার প্রাপ্তি—এসবের ঘেরাটোপে অধিকতর সুবিধাভোগী 'সু-দেবী' অথবা 'উ-বাবু'। অর্থাৎ নারী অথবা পুরুষ। আজকের উত্তর-আধুনিক সমাজেও অন্তত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিতে, বলা বাহুল্য পুরুষই অধিকতর সুবিধা-ভোগী। সে সংসারযাত্রা নির্বাহের আর্থিক দায়দায়িত্বটি যেভাবে সুকৌশলে নারীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেভাবে অন্দরমহলের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়নি তো বটেই, অধিকন্তু বহিরাঙ্গনে বিচরণের নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময়ের সবকিছুর প্রতি শ্যেনচক্ষু খুলে বসে আছে। অনেকটাই বেকুব বনে যাওয়া নারী একই সঙ্গে, বহিরাঙ্গনের এবং অন্দরেরও, দুই দায়িত্বে বাঁধা পড়েছে। ...এখানে আবার কিছু প্রশ্ন উঠে আসছেই, প্রথমত, উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকার অর্জনের স্বাধীনতারূপ বর্তমান সামাজিক পরিবর্তনের উদ্ভূত লাভের ঝোলটুকু পুরুষের পাতেই চলে যাচ্ছে নাতো? দ্বিতীয়ত, নারীর এই দু' নৌকায় পা রেখে দাঁড় বেয়ে চলা চিরদিনই সমান ভাল লাগায় মণ্ডিত থাকবে তো? এবং সর্বশেষ ও বিশেষ প্রশ্ন হলো, সমাজের যে জায়গাটা থেকে মানবকরা নারী এবং পুরুষে বিভাজিত হয়, সে জায়গা থেকে উঠে আসার শুরু থেকেই, দুটি মানুষ পরস্পরের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের অঙ্কুর সঙ্গে নিয়েই আসছে না তো? ...প্রশ্নগুলির উত্তরে যেতে গেলেই এখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় এবং তখনই মনে জাগে মা-সারদার কথা, "নারী নয়, পুরুষ নয়, মানুষ—মানুষ..."।

সমগ্র প্রাণী-জগতের মতোই মানুষেরও কেন্দ্রবিন্দুতে আছে যৌনতা। কিন্তু আদিম আরণ্যক জীবন থেকে উঠে এলেও, পরবর্তীতে সেই মনুষ্যপ্রজাতি যখন সামাজিক এবং জাতি-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন থেকে তার যৌনজীবন, প্রাণীকুলের অন্যান্য প্রজাতি থেকে যে অন্য একটি ধারায় আবর্তন শুরু করেছিল, সেকথা নিয়ে কোথাও কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। সেখানে মানুষের, তথা নারী ও পুরুষ উভয়েরই যৌনাচরণের

একটি সুন্দর সামাজিক ঘেরাটোপ তৈরি করা হয়েছিল, যা মানুষকে মনুষ্যেতর অপেক্ষা একটি পৃথক মর্যাদায় মণ্ডিত করেছিল। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সে মর্যাদা-প্রাপ্তির দায়-দায়িত্বের ব্যাপারটি, নারী ও পুরুষ উভয়ের উপরই ছিল সমান সমান। ...আজ কি আমরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারবো যে সে অঙ্গনে, সভ্য— ক্রমশ আরও বেশি-বেশি সভ্য আমরা উভয়ে আমাদের যথাযথ দায়-দায়িত্ব পালন করছি? নারী ও পুরুষের আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিরন্তর বর্ধিত পারস্পরিক সংঘাতকেন্দ্রিক মিছিল, মাইক, সভা-সমিতিবাহিত অসংখ্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি থেকে তো এটাই উঠে আসছে যে, আমরা আমাদের উপরিলিখিত দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছি না/করতে পারছি না। এই না-পারার প্রেক্ষাপটে সাধারণভাবে, নারী ও পুরুষের ভূমিকা যে সর্বত্র সমান নয়, একথা মেনে নিলেও, অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, পুরুষতান্ত্রিক আমাদের এ সমাজে এক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাটিই অধিকতর প্রভাবশালী। পুরুষ পারিবারিক অঙ্গন থেকে রাষ্ট্রীয় অঙ্গন পর্যন্ত সর্বত্রই যেমন কখনও আপাতরম্য কৌশলী বলপ্রয়োগ, কখনও বা পীড়াদায়ক কুৎসিৎ বলপ্রয়োগ করে আসছে, ঠিক তেমনি যৌনাচারের অঙ্গনেও সে অনেকসময়ই তার বলপ্রয়োগে অভ্যস্তর সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

...সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, নারীর বহিরাঙ্গনে বিচরণের স্বাধীনতা, নারীর ক্রমশ-বর্ধিত অধিকার প্রাপ্তির ভাণ্ডার-কে যতটাই পূর্ণ করুক না কেন, পুরুষের নারীকে সদর-অন্দর দুই অঙ্গনেই, আরও বেশি কাছে পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। মনে করা মোটেই অস্বাভাবিক হবে না যে, নারীর অনুরূপ স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে, বলপ্রয়োগে অভ্যস্ত এবং বিশ্বাসী সেইসব পুরুষদের যৌনাকাঙ্ক্ষা তথা সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা যেন আজ অনেকটাই বল্গাহীন অবস্থানে পৌঁছোচ্ছে। ভেবে দেখা দরকার নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনাকাঙ্ক্ষাপূর্তির অঙ্গন আজ এত দ্রুত বিস্তৃত হয়ে চলেছে যে, সেখানে আশঙ্কা থাকছেই মানুষের আবার ফিরে যাওয়ার সেই পুরাতন অরণ্য জীবনে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আজ তো সংবাদ-মিডিয়াগুলিতে চোখ দিলেই পরিলক্ষিত হয় একদিকে ধর্ষকদের বাড়বাড়ন্ত এবং অন্যদিকে যৌনকর্মীর সংখ্যার ক্রম-উর্দ্ধগতি। পার্ক থেকে শুরু করে হোটেল রেস্তোরাঁ, লজ, নির্মীয়মান ফ্ল্যাটবাড়ি অথবা দীর্ঘ- পরিত্যক্ত বাড়িঘরে দেহ-ব্যবসায়ের সংবাদগুলি তো এখন অনেক সময়ই সামনে উঠে আসে। ভাবনা জাগে, পুরুষ নারীকে অন্দরের সঙ্গে সঙ্গে উপরি-পাওনার মতো বহিরাঙ্গনেও তার উষ্ণ-সান্নিধ্যে পাওয়ার সুযোগ করে নিচ্ছে না তো? ...শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, প্রাক-বিবাহ সহবাস, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, এসবের প্রেক্ষাপটে তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারী-অধিকার, এদের কি কোনো প্রকার ক্রিয়াশীলতাই নেই? ...টিভি, ভিডিও, ভিসিআর ইত্যাদি আশ্রিত চলচ্চিত্র শিল্প, পথ চলতে পথের মোড়ের অসংখ্য ছবির (সিনেমা) হোর্ডিং এবং অগণিত পত্র-পত্রিকার বিনোদনী চিত্রাবলীর সামনে এলে মনে হয়, অম্ল-মধুর অথবা টক-ঝাল বা ঝালমিষ্টি আচারের বোয়েমগুলিকে (জার/শিশি) যদি গৃহাঙ্গনের খোলা উঠোনেই সর্বত্র ছড়িয়ে রাখা হয়, তাহলে ফল্গুর অবস্থানে থাকা নিত্য-রসসিক্ত মন কি ভূমিগর্ভ থেকে ভূমির উপরিভাগে উৎসারিত না হয়ে পারে! ...বিশেষত ছোটদের মধ্যে, আজকের সামাজিক পরিবেশে, এর সংক্রমণকে, আটকে রাখার/সংক্রামিত হলে বিনষ্ট করার জন্য মুখ থেকে শুরু করে কাগজের বুক পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের নিরন্তর শোরগোল কি এতে বিফলে না গিয়ে পারে!...

একথা নিয়েও বিতর্কের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না যে, 'স্বাধীনতা'-র অর্থ যে যার হাতে চোদ্দ-পোয়ার মতো অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই, স্বাধীনতাবোধের সঙ্গে অবশ্যই ঘনসন্নিবদ্ধতায় জড়িয়ে থাকে গোটাগুটি সমাজ/জাতির আধার-মুক্তির ব্যাপারটি। 'স্বাধীনতা'-র প্রকৃত অর্থ হলো, এমন একটি পরিবেশের মধ্যে অবস্থান, যেখানে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সমাজ/জাতি এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশ বা রাষ্ট্রের সুন্দর, সমুন্নত বিকাশ ঘটবে।

পরিশেষে সৃষ্টির আদি থেকে নারী-ই হল জগৎ এবং জীবনের কেন্দ্রীয় শক্তি। আবার সেই নারীই যখন উন্মত্তা তটিনীর মতো সর্বগ্রাসী হয়, তখন সমাজ সংসারের কোনো কূলই সুন্দর, স্বাভাবিক এবং একতার দৃঢ়-সংবদ্ধতায় মণ্ডিত থাকতে পারে না। ...হোক আঁধার আবহে নিমজ্জমান, তবু এই সময়ই বুঝি, নারী-পুরুষ আমাদের, অরণ্য আদিম থেকে সভ্যসমাজে উঠে আসার বেদ-আশ্রিত সমাজব্যবস্থা এবং সেখানে নারীর ভূমিকাটিকে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণে বুঝে দেখার পক্ষে সর্বশেষ সময়। ভোগবাদী পাশ্চাত্যের অন্ধ, অসহায় অনুকরণ থেকে দূরে সরে আমরা যদি আমাদের আপন পরম্পরানুক্রমিক সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারি আজও, তবে বিশ্বের প্রাচীনতম আমাদের এ সভ্যতার অবলুপ্তিকে রোধ করা বুঝি স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব হবে না।

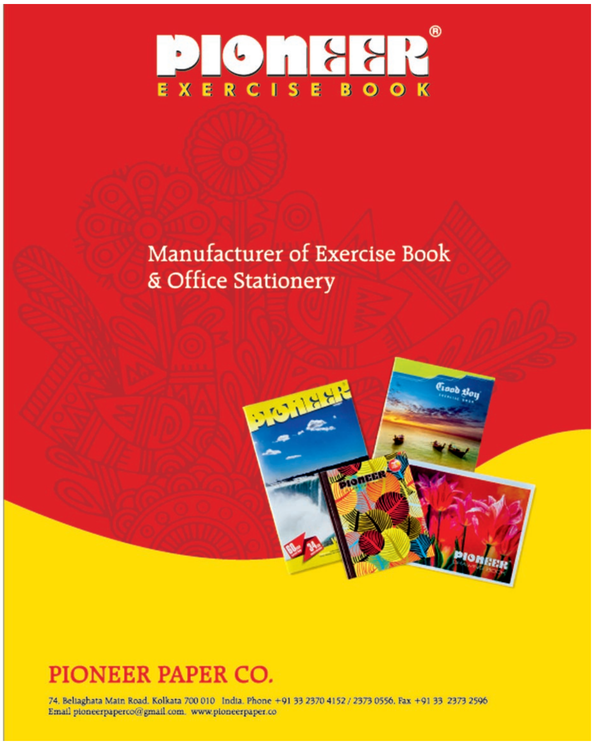

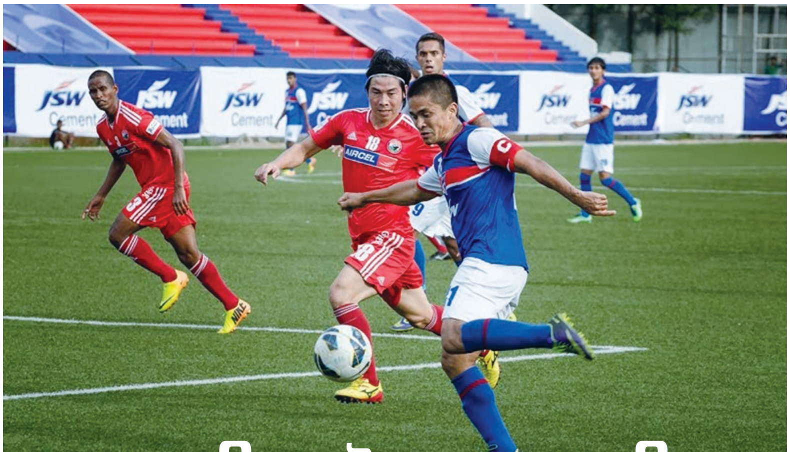

যোগ্য দল হিসেবেই বেঙ্গালুরুর বাজিমাত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের প্রথম ফ্রাঞ্চাইজি ক্লাব হিসেবে বেঙ্গালুরু এফসি প্রথমবার আইলিগে খেলতে নেমেই বাজিমাত করে দিল। আর কলকাতার তারকাখচিত ইস্টবেঙ্গল বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও দ্বিতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকল। অন্যদিকে মোহনবাগান, মহামেডান, ইউনাইটেড স্পোর্টস— কলকাতার বাকি তিন দলের অবস্থা কহতব্য নয়। মহামেডান তো দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যেতে বাধ্য হলো। গোয়ার ডেম্পোও এবার তেমন ভাল ফল করতে পারেনি। পাঁচবারের আই লিগ চাম্পিয়ন দল ডেম্পো আর্মান্দো কোলাসোকে হারিয়ে নিজস্ব ছন্দটাই ভুলে ফেলেছে। আর্মান্দো গোয়া ছেড়ে কলকাতার ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়ে মোটামুটি সফলই বলা চলে। রানার্স করিয়ে অন্তত এ এফ সি কাপে তো নিয়ে যেতে পেরেছেন ইস্টবেঙ্গলকে। তবে বেঙ্গালুরুর সাফল্যের পাশে যথেষ্ট ম্লান ইস্টবেঙ্গল। সব দিক থেকে পেশাদারি পরিকাঠামো তৈরি করে পরিকল্পনাপ্রসূত ফুটবল খেলে আই লিগ জিতে নিল বেঙ্গালুরু।

বৃটিশ কোচ অ্যাসলে ওয়েস্টউডকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে কর্তারা দল গঠনে। তিনি বাছাই করা বিদেশী ফুটবলার নিয়ে এসেছেন দলে। তবে অতিরিক্ত বিদেশী নির্ভর হয়ে পড়েননি। ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীকে অধিনায়কত্বের দায়িত্বভার দিয়েছেন। সঙ্গী হিসেবে রবিন সিংহকে নিজস্ব ওজন বুঝে খেলতে মনোবল জুগিয়ে গেছেন। সুনীল- রবিন জুটি ফরোয়ার্ডে ক্লিক করে যাওয়ায় বিদেশীরা অনেক খোলা মনে খেলতে পেরেছেন। তাদের অতিরিক্ত চাপ নিতে হয়নি। ডিফেন্স, মিডফিল্ড আর ফরোয়ার্ড তিন বিভাগেই যথেষ্ট ভারসাম্য রেখে কখনো পজেশনাল কখনো পার্সেন্টেজ পেনিট্রেটিভ ফুটবল খেলিয়েছেন দলকে বৃটিশ কোচ। তার সুচতুর ট্যাকটিক্স ও গেমপ্ল্যান সর্বোপরি ম্যান-ম্যানেজমেন্ট দলকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বৈতরণী পার করে দিয়েছে। কোচ-তারকা খেলোয়াড়দের ইগোর ব্যাপারটা ভাল ভাবে সামলে তাদের কাছ থেকে সেরা খেলা বার করে নিয়ে এসেছেন। রিজার্ভ বেঞ্চকে তৈরি রেখেছেন সব সময়। খেলোয়াড়দের কন্ডিশন ম্যাচ বাই ম্যাচ পিকআপে নিয়ে গেছেন।

এতো গেল কোচের মুন্সিয়ানা ও খেলোয়াড়দের দক্ষতা, যোগ্যতার গুণগত মূল্যায়ন। মাঠের বাইরে থেকে কর্তারা যেরকম কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট সুলভ বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকার প্রয়োগ দেখিয়েছেন, তাতে এই দলের চাম্পিয়ন হওয়া যেন অনিবার্যই ছিল। গোয়ার দলগুলিকেও ছাপিয়ে গেছে বেঙ্গালুরু এফ সি পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধের দিক থেকে। কোনো কিছুর অভাব রাখেননি কর্তারা। আধুনিক মাল্টিজিম, সুইমিংপুল, ক্রীড়াবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগে ফুটবলারদের শারীরিক, মানসিকভাবে তরতাজা রাখার বন্দোবস্ত করেছেন পুরো মরশুম জুড়ে। কর্পোরেট সংস্কৃতি মেনে টিম গঠন ও পরিচালনা করেছেন কর্তারা। সাপোর্টার বেস তৈরি করে ফেলেছেন পর্যন্ত। আদ্যন্ত ক্রিকেট পাগল শহরে কয়েক হাজার যুবক-যুবতীকে দলীয় সাপোর্টার করে মাঠে হাজির করিয়েছেন। ক্লাবের লোগো দেওয়া টি শার্ট টুপি পরে তাঁরা মাঠে এসে গলা ফাটিয়ে সাপোর্ট করেছেন যা সুনীলদের জেদ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, সংকল্পবদ্ধ করেছে চাম্পিয়নশিপের পক্ষে।

আর যে ব্যাপারটা লক্ষণীয় তা হলো মাঠ ও মাঠের বাইরে সব ব্যাপারে একটা চমৎকার যোগসূত্র তৈরি করা। টিমের সর্বোচ্চ কর্তা থেকে বলবয় সবাই এক পরিবারের সদস্য হিসেবে এক বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। টিমের সবাই একসঙ্গে থেকেছেন, খাওয়া-দাওয়া করেছেন। টিম বাসে করে মাঠে এসেছেন। এ যেন ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের প্রতিচ্ছবি। খেলোয়াড়দের আর্থিক দিকটা কখনো উপেক্ষা করেননি। যার যা পাওনা তা মরশুম শেষ হবার আগেই মিটিয়ে দিয়েছেন। কোচ, ট্রেনার, রিহ্যাব স্পেশালিস্ট, নিউট্রিশিয়ান, ফিজিও, ডাক্তার সবাইকে নিয়ে এক কোচিং স্টাফ ইউনিট গড়েছেন কর্তারা। সবাইকে নিজের কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান ও সম্মান জ্ঞাপন করার মাধ্যমে টিমের ঐক্য ও সংহতির বিন্যাস ছিল উঁচু তারে বাঁধা। বিদেশে যেমন ভাবে বড় ক্লাবগুলি কাজ করে সেইরকম ভাবে কাজ করার সুফল তাই প্রথম আত্মপ্রকাশেই পেয়ে গেল বেঙ্গালুরু এফসি। ভারতীয় ফুটবলে তাই বিপ্লব এনে দিল এই ক্লাবটি। তবে গোয়ার ডেম্পো, সালগাঁওকর ও পুনে এফ সি ও এইরকম পদ্ধতি অবলম্বন করে টিম চালায়। তবে এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় তারা। গোয়ার টিমগুলি মূলত অফিস টিম তাই কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পুনে কিন্তু বিদেশী আঙ্গিকে দল গঠন ও পরিচালনা করছে। তারাও এবছর আই লিগে যথেষ্ট ভাল খেলেছে।

হয়ত আগামী বছর চাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারে। আর কলকাতার টিমগুলি কোটি কোটি টাকার দল গড়েও তলানিতে পড়ে আছে বছরের পর বছর, ব্যতিক্রম ইস্টবেঙ্গল। তারা যদি বেঙ্গালুরু, পুনের থেকে কিছুটা শিক্ষা নিতে পারে তবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, নচেৎ এই অবস্থা চলতেই থাকবে। ইস্টবেঙ্গল কিছুটা হলেও পেশাদারি বাধ্যবাধকতা মেনে কাজ করে বলে তুল্যমূল্য সাফল্য পায়।

শব্দরূপ-৭০৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

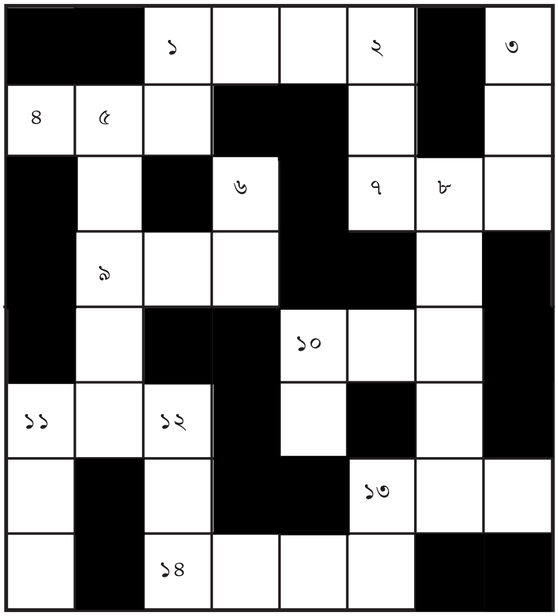

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. এই মাসে হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ, অধিমাস, **৪.** অক্ষয়, অবিনাশী; ব্রহ্ম, **৭.** ভূমির বর্গ পরিমাণ, জরিপ, **৯.** বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত একপ্রকার সাংগীতিক উৎসব, **১০.** মহামারী, **১১.** ভোজন; ভোজ্যদ্রব্য, **১৩.** নদীতে হঠাৎ বানের আবির্ভাব, **১৪.** মনসামঙ্গলে বেহুলার স্বামী।

উপর-নীচ : ১. এই দানব শিল্পী যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণ করেছিলেন, **২.** পৌরাণিক রাজা বিশেষ; ভগীরথের প্রপিতামহ, **৩.** গুজরাটী নৃত্য-গীত, **৫.** যে লোক সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায়, **৬.** সরিষায় কৃষ্ণের প্রিয়া, **৮.** এক প্রকার ধান্য; প্রথম তিনে সুবর্ণ, **১০.** নক্ষত্র বিশেষ (অশুভ বলে অনুমিত), **১১.** প্রাচীন সূর্যবংশীয় রাজগণের রাজধানী (উত্তরপ্রদেশের নগর বিশেষ) **১২.** চতুর্থ পাণ্ডব, **১৩.** শিব।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০৫
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
অনুপ মণ্ডল
মানিকচক, মালদা

		বা	মা	চা	র		ঢে
অ	রু	ণ			স		ম
	দ্র		বে		না	দ	না
	প্র	সা	দ			লা	
	য়া			কা	না	ই	
ম	গ	ন		শ		লা	
য়		ন্ত্র			ধা	মা	লী
রা		তা	রা	মৈ	ত্রী		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭০৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ জুন, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২৬

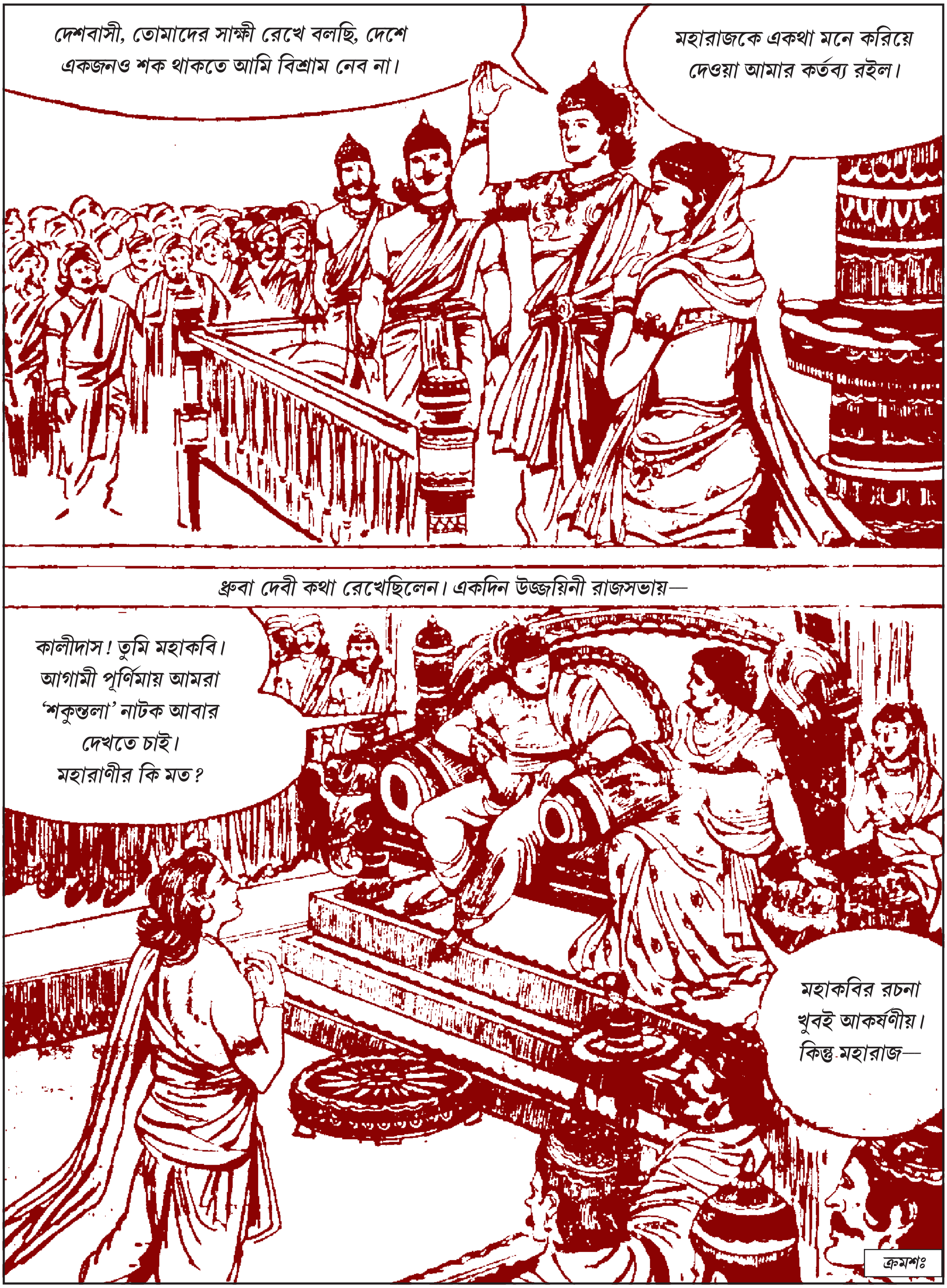

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

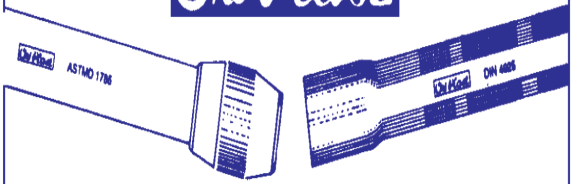

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ভারতীয় সংস্কৃতির একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দুরা কখনও নিম্নতর জাতিসুলভ নৈতিক মান বা তাদের আদর্শ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়নি। এই সত্যটি সেই সৌভাগ্যের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই শক্তিতেই ভারতকে আবার জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

FOR INTERIORS
THAT EVOKE ADMIRATION
For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.
CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…
CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...
CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…
Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM
CENTURYPLY®